Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিষ্ণু দে : নব জগতের নির্মাণে

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.1
Pages	1-66
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বিষ্ণু দে : নব জগতের নির্মাণে

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

Check for updates

মার্কসবাদে আস্থা তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে-র বৈশিষ্ট্য নির্দেশক। প্রথমাবধি ছিল তাঁর বিশ্ববীক্ষা। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণের যুগল স্মরণ দ্রুত সাক্ষাৎ পেয়েছে 'চোরাবালি'র।[১] আধুনিক চৈতন্যে মীথ আর পুরাণ নয়, যা মিথ্যা প্রমাণিত তা-ই মীথ। এবং ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার পর মার্কসবাদ আর মীথ নয়। লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার ও ডব্লিউ. এইচ. অডেনের মতই মার্কসবাদই উত্তরণের পথ—এই বিশ্বাসে বিষ্ণু দে স্থিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে অডেন, স্পেন্ডার মার্কসবাদ থেকে সরে গেছেন; সুধীন্দ্রনাথ হয়েছেন সংশয়ী। কিন্তু বিষ্ণু দে আরাগঁ, এলুয়ারের মতই অবিচল এবং তাঁদের মতই রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীর শিল্প-উৎকর্ষ থেকে চোখ ফেরাননি। অনায়াসে অনুবাদ করেছেন এলিয়ট, এই ভেবে যে, "এ কবির পরিণতির দীর্ঘ মহাপ্রস্থান নমস্যকীর্তি, তাঁর করুণ রাজনীতি সত্ত্বেও।"[২] মার্কসবাদকে মুখ্য জেনে বিষ্ণু দে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের প্রার্থিত সঙ্গতি থেকে বিচ্যুত হননি। সুধীন্দ্রনাথের মতই ছন্দ ও মিলে স্বাচ্ছন্দ্য ও পরীক্ষা-প্রবণতা তাঁরও বৈশিষ্ট্য; অনলস তিনি কবিভাষার শ্রমসাধ্য নব-নব রূপায়ণে।

স্বেচ্ছাকৃত দুরূহতা তারুণ্যে বক্তব্যের সামান্যতা আড়াল করার ক্ষুদ্র কৌশল; যেমন কিশোর রবীন্দ্রনাথের ব্রজবুলির ব্যবহার। তবে এই মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশের দশকে এলিয়ট-পাউন্ডের এবং তিরিশের অডেন ও পরবর্তী স্পেন্ডারের শিক্ষা। আরাগঁর মত তিনিও "কখনো জনসাধারণ বলে কিছু কল্পনা করে 'নেমে' লেখেননি, নিজের আবেগ থেকেই সোজা লিখেছেন যে লেখার ভিতে আছে তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর রাজনীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণার দীর্ঘ ও জটিল সাধনা।"[৩]

বিষ্ণু দে-র কাব্য-সাধনা প্রকৃতই 'দীর্ঘ ও জটিল'। এ-যাবৎ (১৯৮০) তাঁর পনেরটি কাব্যগ্রন্থ ও কয়েকটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবং তাঁর কাব্য বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে প্রসৃত। এলিয়ট ও পাউন্ডের মত ক্ষান্তিহীন তাঁর বিচিত্র উৎস থেকে আহরণ। যা একদা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ, তা লোক-ঐতিহ্য, সমকালীন ঘটনা, বিশ্বসাহিত্য—ইত্যাদি সর্বগ্রাসী হয়েছে। বিষ্ণু দে-র কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ে এলিয়টের অনুপ্রেরণা আছে। এলিয়ট-প্রসঙ্গে একটি ইংরেজী প্রবন্ধে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন :

> Baudelaire and his followers, Gautier, Rimbaud and Mallarme, Laforgue and Valery—together had revolutionised the poetic ideal. It has influenced Eliot and Pound in America and Mayakovosky and Pasternak in Russia. It was our misfortune that our elders in Bengali literature did not bring this message to us ... the liberation of our poetic ideals came vary late, one may say through the medium of T. S. Eliot.[৪]

বস্তুতঃ তিরিশের কবিদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্য-গ্রন্থই যথার্থ অর্থে রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরবর্তী। 'উর্বশী ও আর্টেমিসে' রবীন্দ্র-নাথের নাম অবশ্য আছে, "ছেদ" কবিতায়, কল্পিত বাণপ্রস্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে : 'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।' বিশেষণসমূহ কতটা প্রশংসার বলা মুশকিল, তবে রবীন্দ্র ঠাকুর যে 'উর্বশী ও আর্টেমিসে' নেই, তা নিঃসন্দেহ। এই কাব্যে যে বিদেশী কবির উপস্থিতি আছে, তিনি অবশ্য এলিয়ট নন, র‍্যাঁবো। র‍্যাঁবোর একটি ক্ষুদ্র কবিতার অনুবাদও আছে গ্রন্থে (প্রত্যাবর্তন) :

তার নির্দেশে আজ যে যাই,
সব লিপ্সাই নিভেছে তাই।
সঁপে দিই তাকে শরীর মন—
পুরুষ্কার ও সমর্পণ।
(উর্বশী ও আর্টেমিস, পৃ. ৪২)

'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র মূল ভঙ্গি এ্যান্টি-রোমান্টিকতার ও প্রেমহীনতার :

১　প্রেম আসে প্রেতলোকে যেতে ?　(উদযাপন)
২　আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই (সমুদ্র)
৩　স্বপ্ন সব ঠেলে দাও প্রভাতের গণিকার মতো। (পর্যাপ্তি)
৪　সে ছায়ায় প্রেম নেই, সে ছায়ায় জাগে ক্লান্ত মন (রাত্রিশেষে)

এখানে যে নৈরাশ্য তা র‍্যাঁবোর নরকোত্থিত—'জনহীন স্তব্ধ অন্ধকারে' :

রাত্রির বিশাল মুখ বাতায়নে উঁকি দেয় কালো (অতিক্রম)

একাকিত্ব ও 'ত্রিশঙ্কু'-চেতনায় মনে হয় :

মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর।
　　...　　...　　...
নিত্যকাল ধ'রে এই—দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন,
রাত্রিও প্রশান্তিহীন—ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়।
(উর্বশী ও আর্টেমিস, পৃ. ৫০)

এ কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণের এবং নানা পরিচিত অপরিচিত নামের উল্লেখ বিশেষ ভঙ্গিময়তার প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে—তার কাব্যিক সাফল্য সামান্যই।

'চোরাবালি'তে (১৩৩৭) এলিয়ট (পৃ. ৪১) ও এজরা পাউন্ডের উদ্ধৃতি (পৃ. ৬৭) আছে, আর আছে বহু ব্যক্তির নাম ; সেই সঙ্গে একটি নতুন ভঙ্গি : গ্রন্থের উৎসর্গপত্র ছাড়াও কবিতাবিশেষ ব্যক্তিবিশেষকে উৎসর্গ করেছেন কবি। এই গ্রন্থে বিষ্ণু দে ছন্দোনিরীক্ষায় সাফল্য ছুঁয়েছেন—ফরাসী প্রতীকী কবিদের গীতিপ্রবণ ভঙ্গিতে। যেমন ঘোড়সওয়ার প্রতীককে[৫] ছাড়িয়ে উজ্জ্বল এই কবিতার ছন্দোৎকর্ষ গীতিময় ও নাট্যিক :

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার[৬],
হৃদয়ে আমার চড়া
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?...

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার ?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ? (চোরাবালি, পৃ. ১১-১৩)

'ওফেলিয়া'র ছন্দ-বৈচিত্র্যের পরীক্ষা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা'র সমধর্মী। নাটকীয়তা সত্ত্বেও এখানে আদ্যন্ত অন্বয়-শৈথিল্য সুপ্রত্যক্ষ এবং এর সঙ্গীতধর্মিতাই মুখ্য :

উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা-আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণমায়াকে হানো।
এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমী আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া-আসা। (চোরাবালি, পৃ. ১৭)

'ওফেলিয়া'র নাট্যগুণ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিশ্লেষণ এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

> বাহ্যত ওফেলিয়া যদিচ গীতিকবিতার শ্রেণীভুক্ত, তবু তার ভাব-বিস্তার একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকের উপযোগী; এবং তাতে কবি শুধু প্রেমিকসাধারণের সুদীর্ঘ জীবন কাহিনীর সার সংগ্রহ করেননি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখিয়েছেন যে এ রূপকথার বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য কোনও পক্ষ অপরাধী নয়, সমাজবাসী জীব মাত্রেই প্রাক্তন পাতকের উত্তরাধিকারী বলে, ট্র্যাজেডি এখানে অবশ্যম্ভাবী। তথাচ দিনানুদৈনিক সংসারযাত্রায় ট্র্যাজেডির প্রবেশ নিষিদ্ধ; সেখানে শোচনীয় ঘটনার অন্ত নেই বটে, কিন্তু যে-সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যে মানুষ কার্যকারণের সন্ধান পায়, অথবা ত্রুটিসংশোধনের উপায়

শেখে ; এবং যে চিত্তশুদ্ধির লোভে দর্শক বারংবার ট্র্যাজেডি সন্দর্শনে ছোটে, প্রাত্যহিক শোকে তাপে সে-অন্তর্বেদনার অবকাশ মেলেনা। সেজন্যই ট্র্যাজেডির নায়ক নায়িকারা বস্তুত নাট্যকারদের নিগূঢ় উপলব্ধির মুখপাত্র হলেও সকলেই বিনা ব্যাতিরেকে অলৌকিক মহিমার অংশীদার ; এবং বিষ্ণু দে-র ওফেলিয়া-ও যেহেতু কোন প্রকৃতিকৃপণা পার্থিবা নন, সার্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক, তাই তার সঙ্গে কবি নিজে কথা কননি, অতিমর্ত্য হ্যামলেটের মধ্যস্থতা মেনেছেন। ফলত তাঁর ব্যক্তিগত অভাববোধের গোস্পদে শেক্‌স্‌পীয়র-এর বিশ্বমানবিক ছায়া তো পড়েছেই, তাছাড়া হ্যামলেটী রহস্যের ঘন অন্ধকারে আরও একটি আকাশ-প্রদীপ জ্বলে উঠেছে তারই প্রযত্নে। অবশ্য এই নতুন আলোকের তৈল আর সলিতা যুগিয়েছেন ফ্রয়েড আর উইলসন নাইট। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে-র কৃতিত্বও কিছু কম নয় ; দীপাধারটি একেবারেই তার নিজস্ব ; এবং যিনি অধ্যয়নরূপ পরচর্চাকালেও স্বধর্ম ভোলেন না, তার অবৈকল্য স্বতঃই নিঃসংশয়।[৭]

"ক্রেসিডা"তেও "ওফেলিয়ার" অনুরূপ সঙ্গীতধর্মী শৈলিপক অভীপ্সা ও পরিণাম। এখানে 'ক্রতুকৃতম', 'অলাতচক্র', 'অপাপবিদ্ধমশ্রাবির', 'কৃকলাস' প্রভৃতি প্রস্তরখণ্ড থাকলেও[৮] সমগ্র কবিতার মাত্রাবৃত্ত-শাসিত গীতল গতিপ্রবাহে তা 'খান্-খান্' হয়ে যায়—'লোকায়ত মনে স্বেচ্ছাবর্মে লেগে'। যা জেগে থাকে তা 'সম্ভাষে' / 'জবাসঙ্কাশে'-এর মত মিলের চমক ; 'জড়কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকার করি নর্মাচারে'-এর মত ধ্বনিদ্যোতনার অন্তর্বয়ন ; 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে'-এর মত চরণের বর্ণনার স্বাচ্ছন্দ্য ; 'ক্রেসিডা ! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়'-এর মত স্পন্দন ; এবং সর্বোপরি লক্ষ্যভেদী 'তরবারি' :

তুমি চ'লে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এল রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিলে শ্বেতবাহু দুটি—
স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি ! (চোরাবালি, পৃ. ৮৭)

সুধীন্দ্রনাথের মত বিষ্ণু দে-ও মহাশ্বেতাকে সম্বোধন করেন। বিষ্ণু দে-র অবশ্য আদ্যন্ত প্রশ্ন :

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।
স্বপ্ন-সারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?
অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে,
ক্রান্তিবলয় মিলায় সুমেরুলোকে।
আজ কি আমায় ভুলেছ মহাশ্বেতা ?···

ভাস্কর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি,
প্রাণ-সূর্যের একান্ত সংহতি।
ক্রান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।
উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়,
তামসীকে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা ? (চোরাবালি, পৃ. ৬১)

এই নিরীক্ষার পাশাপাশি এই কাব্যে "মন দেওয়া নেওয়া"-র ('ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে—প্রায়ই করে') মত কবিতায় নাট্যসংলাপ-তুল্য প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা প্রমাণ করে যে বিষ্ণু দে-র পথ সুধীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র। এবং "কবি কিশোর" ও "বেকারবিহঙ্গ" কবিতায় বিষ্ণু দে সেই পথচিহ্ন খুঁজে পান :

১ ··· ··· ··· দিনগুলি ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো।
প্রত্যহ প্রভাতে জানি দীপ্ত দিন ব্যর্থতায় হত
মিলাবে রাত্রিতে বৃথা,—এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস।
(চোরাবালি, পৃ. ৪০)

২ কৈশোরে ছিল ধর্মঘটের শখ,
যৌবনে নয় মাস্টার, কেরানীও।
বাস্তুঘুঘুরই অনুধ্বংস সার।
মুরুব্বি নেই, গ্রাম্য যে উমেদার।

এদিকে শরীর মন হল বরণীয়,
বসন্ত আসে, পাত্রী যে কেউ হোক্।

অতএব, মেসে কাটাও তক্তাপোশে
দৈনিকে দেখ কাজ খালি কোথা ক'ষে,
নেশায় ভিড় ভাঙো মাঠ চ'ষে,
আর দেখ র'সে সিনেমার পোস্টার,
এলবার্ট হলে তারপরে শোনো ব'সে
ঘোলা ইতিহাসে নানাঘাটে উদ্ধার
... ...
ইতিহ-ভাগ্য জড়াক্ না নাগপাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ুপাখা।
(চোরাবালি, পৃ. ৫৫-৫৬)

শেষ দু' চরণে রবীন্দ্রনাথের চরণ সামান্য বদলে উদ্ধৃতিচিহ্নহীন ভাবে ব্যবহার লক্ষণীয়। এই ধরনের প্রয়োগ একাব্যে আরো আছে। যেমন "কবি কিশোর" কবিতায় :

১ আমি চঞ্চল তাই, তাই সুদূরের পিয়াসী
আমি তাইতো আকাশে কান
পেতে শুনি তোমার গান, হে মোনালিসা, হে সাইনারা (পৃ. ৪২)

২ হে মোনালিসা, শুধু হাসো তুমি মধুরহাসিনী অপরিচিতা (পৃ. ৪২)

৩ বহু দূর দেশে জড়তার গ্লানি মেখে শহরের বুকে জরতী সন্ধ্যা নামে। (পৃ. ৪৩)

৪ এমনি ক'রে ফিরেছি পথে পথে
অনেক দূরে ফীটনে পদরথে,
রূপার দেশে রূপালি রাজবালা
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা। (পৃ. ৪৩)

৫ বাদল মেঘ খুলেছে বেণী তার (পৃ. ৪৪)

"শিখণ্ডীর গান" কবিতায় :

৬ ওরে যাত্রী, গেছে কেটে যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি। (পৃ. ৬৯)

"টপ্পা-ঠুংরি"তে :

৭ নামল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নামল সন্ধ্যা,
পিলু বারোয়ার সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা। (পৃ. ৭৭)

৮ বাসের একি শিংভাঙা গো!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিক আর পঁচিশমিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর। (পৃ. ৭৮)

৯ হে বিরাট নদী (পৃ. ৭৯)

১০ পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিট মোটে।
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এল বলে হাওড়ায়। (পৃ. ৮০)

এই রবীন্দ্র-পংক্তির ব্যবহার এলিয়ট ও পাউন্ডের বিচিত্র উৎসের নানা আহরিত পংক্তি ব্যবহারের সঙ্গে তুলনীয়। এই প্রয়োগের লক্ষ্য কখনো বিপরীতাভাস, কখনো সমধর্মিতার ঔজ্জ্বল্য কিন্তু মূলতঃ মোজায়েক নির্মাণ; অবশ্যই অহেতুক নয়। সেদিক দিয়ে দেখলে বিষ্ণু দে সব সময়ই সফল হয়েছেন বলা যায়না। তবে তাঁর এ্যান্টি-রোমান্টিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে রোমান্টিক রবীন্দ্র-পংক্তি প্রয়োগ, অবশেষে তাঁকে রবীন্দ্রনাথেই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

তৃতীয় কাব্য 'পূর্বলেখ' (১৯৪১) তিনি উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। কাব্যান্তর্গত বিভিন্ন কবিতা ও কবিতাগুচ্ছ পূর্ববৎ নানাজনকে উৎসর্গ

করেছেন, এমনকি কোন কবিতার অর্ধাংশ (যেমন 'মুদ্রারাক্ষস') একজনকে আবার কোন কবিতার এক এক অংশ এক এক জনকে (যেমন 'বৈকালী') উৎসর্গ করেছেন কবি। এটাও এক ধরনের প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। এ কাব্যেও র‍্যাঁবো আছেন "মুদ্রারাক্ষসে'র দ্বিতীয়াংশে দু' চরণ উদ্ধৃতিসহ। আছে মিতভাষিতা, ছন্দ-পরীক্ষা ও মিল-বিন্যাসে উত্তরণ :

অনিদ্রাঘেঁষা স্বপ্নসাগরকিনারে ঘর
আকাশে বন্দী সে গজমোতির মিনারে ঘর--
বৃথাই লজ্জা, বৃথা ভয় আজ স্বয়ম্বর
বারণাবতের ছদ্ম ছিন্ন দগ্ধ দীর্ণ হে বর্বর।।

তেমনি আছে অসম চরণের অক্ষরবৃত্ত ও আপাতঃশিথিল, সংলগ্নতাহীন নানা অংশে বিভক্ত, নানা ছন্দে ঝংকৃত, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতা। এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে, এ কবিতায়ই প্রথম মার্কস্-এর নাম উচ্চারিত হচ্ছে :

মার্কস্ না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহণ্নলা-বেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,
শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।
(বছর পঁচিশ, পৃ. ৪৭৩-৭৫)

ইতিহাসে নিবদ্ধ হচ্ছে দৃষ্টি, খুলে যাচ্ছে নৈরাশ্য-পীড়িত নগরের দরজা-জানালা, দেখছেন তিনি বাংলার গ্রামে লোকজীবনের দুর্দশা। "বৈকালী" কবিতার প্রথমাংশে :

ঝির্ঝিরে মরা নদী, মজা খাল, কচুরিপুকুরে
দুই হাটে মারামারি, মেলা নিয়ে জেলাবোর্ডের ব্যবসায়
টিউবওয়েল কেই বা বসায়
প্রকৃতির কোলে আর শান্তি নেই, পাটকলে যায়!

পরবর্তী চরণে অবিকল লেখা হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে যেন :

দূর থেকে নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমাপ্রার্থনা :

ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো তুমি দুর্মর জীবন ভরো গানে

এবং অতঃপর দুর্দশাগ্রস্ত লোকজীবনেই দুর্মর জাগরণের প্রত্যাশা জেগে উঠছে :

বাজের হাঁকে শমন ডাকে ছড়ায় গানের বীজ মাটিতে
গাঁয়ের জমি উথলে ওঠে, নদী উছল ভরাটিতে।
নদীর পাকে বাজের ডাকে চিকুরজ্বালা এই বরষায়
ভাঙবে গদি ভাস্‌বে বানে গানের সুরে এই ভরসায়
শালিজমির মাটি চষি, একলা ভাবি দলে দলে
বীজবপনের ছন্দ কবে কাস্তে চালার ছন্দে চলে।

এই প্রথম কৃষক ও শ্রমিকের জীবন সংগ্রামেই মুক্তির নিশান উড়তে দেখছেন কবি, শুনছেন জীবনজয়ের বিষাণ :

তবু চলে বুঝি বীর নয়, শুধু
লাখো কৃষাণ
ধূসর আকাশে দুর্মর শিরে
ওড়ে নিশান।
প্রখর তাপের আগুনের গোলা
সেজেছে মাটি
বিলাসী বর্ষা পাহাড়ের শীতে
পেতেছে ঘাঁটি।
সূর্য হেনেছে পক্ষপাতের
লাখো কৃপাণ।
চলে বীর নয়, হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।
আঁধার খনির বুকচাপা তাপে
তারাই ঘোরে
চিমনির ধোঁয়া তারাই টেনেছে
কলিজা ভ'রে।

বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে
অমর প্রাণ
বীরদল চলে হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।
হে সূর্যদেব সাজেনা তোমার
এ অভিমান
শাণিত আকাশে উগ্র নিশানে
শোনো বিষাণ।

লোকজীবনের এই জাগরণ-সম্ভাবনার বিপরীতে নগর জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ বেজে উঠছে ঐ একই কবিতার তৃতীয়াংশে :

তাই সংক্ষেপে, সব লক্ষণই জানো—
বসন্ত আসে শহরে মানো না মানো,
গরম হাওয়ায় সেই সুখবর রটে,
গলা পিচে আর উচ্ছল ডস্‌ট্‌বিনে,
স্ক্যাভেঞ্জারের অকাল ধর্মঘটে
বসন্ত আসে দুর্গন্ধের দিনে!
হৃদয় জেনেছে তোমার পায়েই লোটা।
যুগধর্মের তালে তালে এসো চলি,
এদিকে ওদিকে বদলিয়ে পদাবলী,
বাহুবন্ধনে গন্ধশিশির ফোঁটা।

কবিতার ষষ্ঠাংশে পুনশ্চ নাগরিক দ্বন্দ্বাভাস : এ্যান্টি-রোমান্টিকতার পরিপ্রেক্ষিত :

আকাশে উঠ্‌ল ওকি কাস্তে না চাঁদ
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে! [৯]
জুঁইবেলে ঢেকে দাও ঘন অবসাদ,
চলো সখি আলো করো ভাঙা নেড়া ছাদ,
শুকাবে ঘামের জ্বালা মলয়প্রসাদ,
মরা জ্যোৎস্নায় চলো ভাস্‌তে।

সপ্তম অংশে 'সর্বনাশা অর্থাভাবের' কথা, যেখানে 'বণিকের আয়ু' 'উন্মত্ত স্বার্থের শক্তি' আর বিপরীতে শোষিত জনতার আর্তনাদ :

বসুন্ধরা সর্বহারা, ক্ষুধার্তের ঘর্মে শূন্য খনি,
স্তূপাকার রসদের বস্তা পচে, খুঁজে মরে ধনী।
ধামাচাপা ধর্মঘটে, নির্মনন শূদ্রচল রথে।
ধর্মধ্বজ লোভ ঘোরে সৈন্যকণ্টকিত রাজপথে
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষাত্রমৃত্যু খুঁজে পায় মিতা
রক্তবীজ ব্যাসিলাসে, নিত্য শুনি মরণসংহিতা।
জনতায় আর্তনাদে অস্বাস্থ্যে ও কোলাহলে ভরে
ধোঁয়ায় মলিন ধূম্রলোচনের পীঠস্থান ঘরে।

অষ্টম অংশে ছুটি-র[১০] অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা 'শুধু ছুটি শেষে হিংস্র শহরে ফিরবে হৃদয়ে মধুর স্মৃতি'র পরোক্ষতায় মেলানো।

কবিতার নবম অংশে প্রশ্নমালা, আবার মহাজন ও কৃষকের প্রসঙ্গ :

মহাজন তার মাহাত্ম্য তবে
কি মুলতুবি
করবে [কখনো, কখনো ভর্‌বে
সব বকেয়া ?
কখনো ফসলে জাঁকিয়ে ভর্‌বে
কালের খেয়া ?
তবু আছে মাটি, আর আছে ঘর,
দুর্মর প্রাণ,
কত কাল বলো পাশায় হারাবে
লক্ষ কৃষাণ ?

দশম অংশে বিচ্ছিন্ন ভাবে আশাবাদ 'জানি শেষ হবে রোষকষায়িত সন্ধ্যা' এবং এক নবজাতকের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ :

তোমার জীবনে নূতন কালের সূর্য
হাসি কান্নার সুস্থ আলোয় হাস্‌ছে

সে আলোর প্রাণ মুক্তি-প্রবল তূর্য
তোমার কণ্ঠে হাসিকান্নায় ভাসছে।'
(ব. পঁ., পৃ. ৪৮২-৯৩)

কবিতাটির দশটি অংশে পারম্পর্যের অভাব আছে। বিচিত্র ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিচিত্র বক্তব্যে সমাজের নানামাত্রিক চৈতন্যকে হয়ত কবি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন—সেদিক থেকে পরবর্তীকালের দীর্ঘ কবিতার সংগঠনে পটভূমি হিসেবে এই কবিতার গুরুত্ব আছে। তবে উল্লেখযোগ্য, এই কবিতার দশটি অংশ প্রকৃতপক্ষে দশটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা।

'পূর্বলেখ' প্রথম সংস্করণে[১১] উল্লেখিত হয়েছিল: "কবিতাগুলির অধিকাংশই ১৯৩৫-৪০ সালে সামাজিক উপলক্ষ্যে বা ফরমায়েসে লিখিত।" এই সংবাদ সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার 'পূর্বলেখ'-এর পটভূমি 'চোরাবালি'র "চেয়ে অনেক ব্যাপক"; "সামাজিক ক্ষয়ের চেতনা কবির মধ্যে অনেক বিশাল ও গম্ভীর হয়েছে।"[১২] 'পূর্বলেখ' প্রসঙ্গে সমর সেনের সমকালীন প্রতিক্রিয়াও স্মর্তব্য: "বিষ্ণুবাবু ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, তাঁর কাব্যে ব্যর্থতাবোধ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে যে অন্ততঃ 'চোরাবালি' পর্যন্ত তাঁর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি খুব সার্থক হয়নি, কারণ "শিখণ্ডীর গানে' যে শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তারা এতই অসার যে তাদের সম্বন্ধে কবিতাও সার্থক হতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রতিক রচনায় বিষ্ণুবাবুর ব্যর্থতাবোধ আরো গভীর হয়েছে, কারণ তাতে বেদনাবোধের প্রমাণ আছে। তাঁর আধুনিক লেখায় সক্রিয় জীবনদর্শনের নিদর্শন পাওয়া যায়, যে দর্শন কয়েকটি উগ্র বামপন্থীদের কাছে অসার হতে পারে, কিন্তু যার গতি সত্যিকার বামপন্থী বা হিউম্যানিজম্-এ প্রতিষ্ঠিত।"[১৩]

'পূর্বলেখে'র প্রথম কবিতা "বিভীষণের গান" প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের টীকা: "রাক্ষসেরা স্বর্ণলঙ্কা গড়েছিল লুণ্ঠিত অর্থে, বিভীষণ তাদের দিক ছেড়ে গেল মানুষের দিকে, নির্যাতকের শ্রেণী ছেড়ে নির্যাতিতের শ্রেণীতে। কবিও দিক বদল করেছেন। টীকার সাধারণ শোনালো, কিন্তু বিষ্ণুবাবুর কাব্যে অপরূপ। সেটাই প্রতিভা, দিক বদলটুকু উপলক্ষ্য হয়তো। তবু সার্থক সন্দেহ নেই; কারণ এতদিন তাঁর কবিতায় বিশ্বাসের মূলসূত্র ছিল না, 'পূর্বলেখে' তা এল।"[১৪]

"পদধ্বনি" কবিতার পটভূমিতে আছে "মহাভারতের মৌষল পর্বের শেষ দুটি অধ্যায়"। "যদুকুল ধ্বংস হয়েছে। ধনঞ্জয় তখন যদুবংশীয় কামিনীগণ ও ধনরত্ন নিয়ে পঞ্চনদ দেশে। এমন সময় দস্যুদল আক্রমণ করল, কুরু-ক্ষেত্রের বীর বাধা পর্যন্ত দিতে পারলনা, তাও নিছক শক্তির অভাবে।"[১৫] এই পটভূমি বিষ্ণু দে ব্যবহার করছেন প্রতীক হিসেবে। "ধনঞ্জয় তখন পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রতীক। যতদিন এ সভ্যতার শিরায় রক্ত ছিল যৌবনে চঞ্চল, ততদিন তার ইতিহাস শুধু দিনের পর দিন জয়ের ইতিহাস। এখন ভাঙন ধরেছে, পুরোনো শক্তি নেই, স্মৃতিটুকু আছে মাত্র। তাই অনার্য আক্রমণের বাধা দিতে পারে না, একে দস্যুবৃত্তি বলে অথর্ব অভিসম্পাত করে শুধু।" [১৬]

অকস্মাৎ পদধ্বনি শুনে জেগে ওঠে স্মৃতি :

প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?

স্মৃতি থেকে বর্তমানে :

কার পদধ্বনি আসে ? কার ?
এ কি হল যুগান্তর ! নবঅবতার !
এ যে দস্যুদল !
হে ভদ্রা আমার !
লুব্ধ যাযাবর ! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাঝালা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?

উপসংহারে পুরাণ ও বর্তমান একাকার :

পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার !
চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মত্ত পদধ্বনি,
ক্ষমা করো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসূয়ারে।
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার !
হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয়।
(ব. পঁ., পৃ. ৫০৪-০৮)

কেবল লক্ষণীয়, পুঁজিবাদী সভ্যতার বিনাশভীত বিশ ও তিরিশের দশকের ইওরোপীয় কবি-ঔপন্যাসিক-চিন্তাবিদদের রচনানুপ্রাণিত বিষ্ণু দে এখানে, তাঁদেরই মত, 'অক্ষম' 'ধনঞ্জয়ের' জন্যই বেদনার্ত।

মহাভারতীয় পুরাণ প্রতীকে চেতনানুবাদের ফলে 'চতুর্দশপদী'র[১৭] ১৪ সংখ্যক কবিতায় নিজেকে তিনি ধনঞ্জয়ের সন্তানের সঙ্গে একাত্ম করে ভাবছেন :

পিতা তার ছিন্নভিন্ন, শকুনি ও শিবার আহার,
যাযাবর দস্যুদল-দমনের ব্যর্থ শ্রমে হত।
পূতিগন্ধ ভিড়ে শুধু নতমুখে পরিব্রজরত
সুভদ্রা বা সত্যভামা।

উৎসবের বসন্তবাহার
অশ্রুজলে সুরহীন। ধ্বংসবহ তুষার-ভৃঙ্গার
ঢেলেছে নৃশংস ঝড়ে কংস বুঝি প্রেতলোকগত।
মথুরার মৃত্যুহীন স্মৃতিভারে ক্লিষ্ট পরাহত
দ্বারকার দীর্ণ পথ, জীর্ণ শীর্ণ পল্লব বৃন্দার।

মাতা তার পথচারী, অন্নের আদিম অন্বেষায়।
দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভবাহনে।

ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গী এল শ্রাবণপ্লাবনে।
গলিতবলভী ঘরে মুক্তদ্বারে যুগান্ত-হেষায়
নির্বোধ নির্বোধ শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে!
বসুন্ধরা দেখে তাই, হয়তো বা বাসুদেব শোনে ॥
(ঐ, পৃ. ৪৭২)

—ষষ্ঠকে স্বকালের পরিপ্রেক্ষিত উচ্চকিত।

'পূর্বলেখ'-এর আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা "জন্মাষ্টমী"। এ কবিতা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন টিকে থাকার ক্লেদাক্ত টুকরো ছবির বিশৃঙ্খল সজ্জা। এরই মধ্যে মনের অতলে জেগে উঠছে সম্ভাবনার গান। কবিতার শুরুতে বিটোফেনের ডি মাইনরে ৯ নম্বর সিম্ফোনীর এক চরণ উদ্ধৃতি তার ইঙ্গিতবহ। যে কুৎসিত জীবনে গান নেই তাকে ধিক্কার দিয়ে প্রাণসঙ্গীতের সম্ভাবনায় জেগে ওঠার আহ্বানই তাই কবিতার উপসংহারে, বর্তমানের ব্যর্থতার উচ্চারণে, ধ্বনিত হয়:

আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্যসঙ্গীতে,
অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয় সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই,
কুণ্ঠীরক তাই ॥ (ব. পঁ., পৃ. ৫২৮)

অন্যদিকে সমকালীন ইওরোপে যে স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটছে তার ছবি "১৯৩৭-স্পেন" শীর্ষক কবিতায়:

চাচা-র আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রুমিত্র ॥ (ব. পঁ., পৃ. ৫০৩)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে কলকাতায় সংগঠিত হয় 'ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সংঘের সম্পাদক ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে। সংঘের একটি প্রকাশনা হিসেবে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থ '২২শে জুন', প্রকাশক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এতে ১৩টি কবিতা ছিল। পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়নি। তবে ঐ পুস্তিকার "জনযুদ্ধ" ব্যতীত ১২টি কবিতা ও আরো ৩২টি কবিতা—মোট ৪৪টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে-র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পা'; এ-গ্রন্থের একটি 'দ্বিতীয় শিরোনাম' ছিল; '২২ শে জুন ও অন্যান্য কবিতা'। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো ১৯৪১—৪৪ সালের মধ্যে রচিত। স্বভাবতই এ পর্যায়ের কবিতার পটভূমিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। এখানে বিশ্বদৃষ্টি মার্কসবাদী বিপ্লবীর, যিনি সচেতন 'অসহায় কলিকাতার' মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে।

বুদ্ধদেব বসু 'সাত ভাই চম্পা'কে বিষ্ণু দে-র প্রধান কাব্যগ্রন্থ মনে করেননি, তবে বলেছেন "স্বল্প পরিসরের এটি তাঁর পরিণতির বেগবান বাঁক।"[১৮] গ্রন্থের বিষয় প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য: "কবিতাগুলি বেশির ভাগই জনযুদ্ধ, জাপানি আক্রমণ, চোরাইবাজার প্রভৃতি সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা; কবিত্বের চাইতে চতুরতার অবকাশই সেখানে বেশি—কিন্তু সাময়িককে তিনি মহিমান্বিত করেছেন প্রথম সনেটটিতে (২২ জুন ১৯৪১) এবং জাত কবিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন শেষ সনেটে (সূর্যাস্ত)। ··· আকাড়া প্রপাগাণ্ডাও বিষ্ণুবাবু করেছেন কিন্তু 'ভারতীয় বিমানবাহিনী' ও 'মফস্বলে'র আবেগময় গাম্ভীর্য, 'বুড়ো ভোলানো ছড়া' আর 'কতবার এল কত না দস্যু'র হালকা ধারালো চাল মনের মধ্যে সেই অনুরণন জাগায়, কবিতা ছাড়া আর কিছুই যা দিতে পারে না।" [১৯]

'সাত ভাই চম্পা'র কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালেই এক আলোচনায় অরুণ মিত্র লেখেন: "··· তিনি এ গ্রন্থে বেশি ঝুঁকেছেন সরল বিবৃতির দিকে। ভবিষ্যৎ 'সমসমাজের' প্রতি বিশ্বাস, ···অমর জনসাধারণের অবধারিত মুক্তিতে বিশ্বাস, বিশ্বব্যাপী অত্যাচারের শক্তিকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতায় বিশ্বাস 'সাত ভাই চম্পা'র মূল সুর। এই কারণে সমসাময়িক কাব্যে এ গ্রন্থ মূল্যবান। ···সমস্ত জটিলতা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র আগেকার বহু

কবিতা অনুভূতিকে প্রগাঢ়ভাবে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু 'সাত ভাই চম্পা'র প্রধান আবেদন যেন সোজাসুজি প্রত্যক্ষ আশাবাদী বুদ্ধির কাছে।"[২০]

লক্ষণীয়, বুদ্ধদেব বসু ও অরুণ মিত্র বিষ্ণু দে-র কবিতার পালাবদল সম্পর্কে সতর্ক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। উভয়েই কবিকে কাব্যশিল্পের প্রতি নিবিষ্ট থাকতে পরামর্শও দিয়েছেন। অবশ্য, 'সাত ভাই চম্পা' কাব্য-গ্রন্থ সম্পর্কে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল: এ-কাব্যে প্রাচীন পুরাণ ছেড়ে কবি মার্ক্সীয় চৈতন্যের ব্যাখ্যাসূত্রে ঝুঁকছেন লোকঐতিহ্য ও লোকপুরাণে।

'সাত ভাই চম্পা' শীর্ষক প্রথম কবিতার শীর্ষে আছে প্রসঙ্গের তারিখ "২২ জুন ১৯৪১"। কবিতাটি "২২ জুন" নামেই প্রকাশিত হয় পত্রিকায় ও '২২শে জুন' গ্রন্থে। ঐ দিন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে এবং ফ্যাসিবাদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির নির্মোক সরে যাওয়ায় রাশিয়া প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামে। কবিতার বক্তব্য :

> জনগণমনে অধিনায়কের শূন্য স্থান, পূর্ণ করো বীর!
> শেয়ানে শেয়ানে হোক্ কোলাকুলি সঙ্গোপনে ; তবু চীন, রুশ্—
> দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
> স্বার্থের বধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির
> জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, ভারতেরও ভিৎ টলে, প্রাণের নির্দেশে
> কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা ঝাড়ে দূর দেশে দেশে।।
> (ব. পঁ., পৃ. ৪২১)

যুদ্ধে ভারতীয় বিমানবাহিনীর জনৈক আত্মদানকারী বৈমানিকের প্রসঙ্গ এসে পড়ে কবিতায় :

> মৃত্যুহীন চিদম্বরে সে তো জানে আদিগন্ত
> জীবনের অনির্বাণ গতি,
> সে কিশোর বীর!
> ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে
> নূতন চেতনাচৈত্য রচনা করে কি, দুই হাতে,
> বিপ্লবী পাখাতে, সোনালি ঈগলে তার,

চোখে সূর্য, পায়ে তার কর্ণফুলি মৌন, ইরাবতী
প্রতীক্ষায় স্থির ?
("ভারতীয় বিমানবাহিনী", ব. পঁ., পৃ. ৪২৪-২৫)

"১৯৪২" শীর্ষক কবিতায় ছড়ার আঙ্গিক প্রযুক্ত হয়, বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ও যুদ্ধশেষে, সাধারণ মানুষের জয়ের প্রত্যাশায় :

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
মৃত্যু হানে উলুর বনে,
বৃন্দাবনে মড়ক জ্বলে
ভূগোল ফাঁপে অগ্নিবাণে।
উধাও রাজা উলুর ভিড়ে;
এবারে বুঝি ভিজ্‌বে চিঁড়ে!
(ব. পঁ., পৃ. ৪২৬)

"এ জনতার" কবিতায় প্রত্যয়ী উচ্চকণ্ঠ :

কতবার এল কত না দস্যু। কত না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কত গ্রাম উজাড়
কত বুলবুলি খেল কত ধান,
কত মা গাইল বর্গীর গান,
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার।

অমর দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ,
মূঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন গান।
দীর্ঘকালের ধরাজলে জলে
চেতনার পলি সোনালি ফসলে
এ দেশে বন্ধু কতকাল ফলে।
মাটির টান
দিকে দিকে জ্বলে, পুড়ে ছারখার তাণাকা-সান্।
(ব. পঁ., পৃ. ৪২৭)

এ কাব্যের "প্রতিরোধ" কবিতায় রুশ কবি টিখোনভের "১৯২২" শীর্ষক কবিতার প্রতিধ্বনি :

দুদিন আসে লেলিহরসনা। পাগলা হাতির পাল
ছুটেছে অর্থগৃধ্নু অস্ত্রমাতালের অঙ্কুশে।
যুগান্তে আজ ছিঁড়ে যায় বুঝি আল্‌গা মাটির কাল—
নবজীবনের বীজবপনের প্রাণ হারানোর ক্রুশে।

ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোম্‌রা গড়েছ হাল।
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও, মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল ।।
(ব. পঁ., পৃ. ৪৩২)

"২২ শে জুন, ১৯৪২" লেখা হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে। কবিতাটির প্রথমে স্টালিনের উদ্ধৃতি আছে এবং কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে আশাবাদ :

নীলকণ্ঠ ইতিহাসে বহুদীর্ঘ উৎরাই-চড়াই
কৈলাসে হয়েছি পার। চোখে জাগে নবীন সভ্যতা,
অজেয় প্রাণের অগ্নি রক্তাক্ত সে জনতার হাতে
মৃত্তিকাসন্তান যারা, মৃত্যুহীন, যুগান্তসাক্ষাতে
নির্ভীক, কর্মিষ্ঠ যারা। তাই আজ উচ্ছ্বসিত কথা
আমাদেরও, মৃত্যুহীন সমাজের করি জয়গান
উজবেক্, তাজিক্, তুর্কী, কাজাক্—ও দূর হিন্দুস্থান।।
(ব. পঁ., পৃ. ৪৩২)

এই কাব্যে লোরকার প্রতিধ্বনি উল্লেখযোগ্য, "ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার ছায়ায়" শীর্ষক কবিতায়। 'সম্পূর্ণ সমাজ' 'সবল সুস্থ কাজের মধ্য দিয়ে নির্মাণের' পর 'স্বাভাবিক শয্যায় সহজে' কমরেড মৃত্যু কামনা করছেন—তার আগে নয়। 'এক রাজনৈতিক গোষ্টীপতিকে' জনপ্রিয়তায় বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত করতে চাইছেন। বলছেন :

তোমার যে পরিচয় সে নয় তোমার।
সে বিরাট জনতার আন্দোলনে ভাসে। (ব. পঁ., পৃ. ৪৩৯)

এবং ভাবী "নবসমাজে"র প্রত্যাশী কবি নিজেকে তাই ভাবছেন শেষ রোমান্টিক হিসেবে :

হয়তো এই আহুতি শেষ হ'লে,
নব-সমাজ গড়ার রলরোলে,
শান্তি যেথা সমান সুখ খোলে,
হারিয়ে যাব সেখানে জনতায়।
সেখানে নেই বোমাতাড়ানো দেয়াল,
পথিক প্রেম মৈত্রী, নয় খেয়াল ॥
("শেষ রোমান্টিক", বছর পঁচিশ, পৃ. ৪৪০-৪১)

তবু আত্মজিজ্ঞাসা জাগে—মৈত্রীতে যে কর্মীরা মিলেছে তাদের হতে হবে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ, লক্ষ্য স্থির :

নব জগতের নির্মাণে
কর্মীরা মেলে মৈত্রীতে।
শত্রুর মুখে তীর হানে
একাগ্র বেগে, সংবিতে
একটি লক্ষ্য স্থির জানে।
এখানে দ্বিধার ঠাঁই তো নয়,
শত্রু কখনো ভাই তো নয়,
কর্মক্ষেত্রে বীর জানে
নিজ প্রত্যয়ে অকুতোভয়
নব জগতের নির্মাণে ॥
("আত্মজিজ্ঞাসা", ব. পঁ., পৃ. ৪৪৩-৪৪)

"২২শে জুন ১৯৪৪"-এ, অর্থাৎ সোভিয়েট যুদ্ধারম্ভের তৃতীয় বার্ষিকীতে, মহাযুদ্ধে তৎকালীন মৈত্রীর প্রসঙ্গ :

দেশে দেশে সাড়া পড়ে, মিত্র জাগে শত্রুর শিবিরে
মিলটনের ভ্রষ্টস্বর্গ শৃগালশিকারী ছোট দ্বীপও

সোভিএট্ গান ধরে, সৈন্যদল সাজে অবশেষে,
জেগেছে ফরাসী হাস্য আলজীরের উষার তিমিরে,
তিতোর পতাকা বয় সাম্রাজ্যপুতলী বহু নৃপ,
মানবমর্যাদা শোনো ঐকতানে এ উপনিবেশে ।।
(ব. পঁ., পৃ. ৪৫৪)

লক্ষণীয় কবি দেখছেন তাঁর স্বদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে যা তখন উপনিবেশ ; এবং তাই স্বদেশের ভাবী সম্ভাবনার ধ্বনি জাগে ''চতুর্দশপদী''তে :

দুর্ভিক্ষের বঞ্চিত হাতে বানাব বিজয়ী বেশ
লক্ষ দুস্থ মুমূর্ষু হাড়ে নরকের ভীড় ভেঙে
আমাদেরই ক্ষীণ হাতে বলবান নাড়াব কালের চাকা
অমৃতের ঢাকা খুলবে মুক্ত হিরণ্ময় স্বদেশ ।।
(ব. পঁ., পৃ. ৪৫৫)

'সন্দীপের চর' (১৯৪৭) যখন প্রকাশিত হয় তখন ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসানে এবং এক রক্তক্ষয়ী হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার পরে, পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের ও পশ্চিমবাংলা ভারতের অন্তর্ভু হয়েছে। এ গ্রন্থের শেষ কবিতায় কলকাতায় ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ। তবে যেহেতু এ গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৪-৪৭, সেহেতু অনেক কবিতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রসঙ্গ ও কবির দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব বিধৃত। তাছাড়া আছে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বপরিপ্রেক্ষিত, বাংলা-দেশের দুর্ভিক্ষ এবং উত্তরণের সংকট ও সম্ভাবনা।

''সন্দীপের চর'' শীর্ষক কবিতা কবি উৎসর্গ করেছেন আত্মদানকারী বিশিষ্ট প্রগতিশীল কর্মী লালমোহন সেনের উদ্দেশে। বঙ্গোপসাগরের কোলের এই 'প্রকৃতির মায়া' সন্দীপের চরে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে কবি দেখছেন :

আজকে সবাই প্রতিবেশী ভাই, হে প্রকৃতি, ভুলে যাই
জীবনের মরণের হারে বাঁধা জীবনের ছবি
আজ শুধু মারি, মরি, পুড়ি ও পোড়াই, ক্ষেপি আর লুটি।

১৯২৬ সালে কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে নিজের ভুল বুঝে উভয়ের প্রকৃত শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই আশায় উজ্জীবিত হতে চেয়েছিলেন ; বলেছিলেন :

১　শত্রুর গোরে গলাগলি কর্ আবার হিন্দু-মুসলমান !
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান ![২১]

২　যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া !
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ
চিনিবে শত্রু চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয় কেতন উড়া !
ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া ![২২]

নজরুলের প্রায় কুড়ি বৎসর পর বিষ্ণু দে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় এমন 'আশান্বিত' হবার কিছুই দেখছেন না ; তিনি বরং লক্ষ্য করছেন :

এ মরণে প্রাণ নেই, এতো নেশা উন্মাদের
শক্তিমদমত্ত অন্ধ পাগলের অপ্রাকৃত আঁধি !...

এই রোগে এ মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে

বিষ্ণু দে জানেন :

আমাদেরই কর্মে লেখা আমাদের দুর্গত জীবন
আমাদেরই ভবিষ্য ও স্মৃতি।

কবি দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ সমকাল পার হয়ে যেতে চান বিশ্বব্যাপী নবজাগরণের জোয়ারের একান্ততার অনুপ্রেরণায় ; 'হে আদি জননী সিন্ধু' এই রবীন্দ্র-পংক্তি[১৯] উদ্ধৃত করে তিনি বলেন :

হে আদিজননী সিন্ধু অয়ি শুচিস্মিতা
তোমার চোখের আলো কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে
তেলাঙ্গানা বাংলায় কত গাঁয়ে দূর রুশে

বেল্‌গ্রেডে প্যারিসে প্রাগে রক্তরাগে প্রাণে জাগে
হে মৈত্রেয়ী প্রজ্ঞাপারমিতা।

আর এই 'পরিক্রান্ত মিলে'ই তিনি দেখেন উত্তরণের সম্ভাবনা :

আমাদের ঘরে বাঁধি পরিক্রান্ত মিল
পুনরাবৃত্তিতে নয়, নতুন আখরে নব নব শ্লোকে
তবু দেখি দোহারের ঘনঘটা থেকে থেকে ছিঁড়ে যায়
দুরন্ত হাওয়ায়, ভেঙে যায় খিল
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে বালিয়াড়ি দূরের সিসূম
ডোবায় আপন-পর
বিশ্বব্যাপী আমাদের ঘর ছড়ায় ভূলোকে
ছত্রভঙ্গ কালের হাওয়ায় আমাদের মিল সম্বাদে ও প্রতিবাদে
আরেক যতিতে বাঁধি আকাশের বিস্মিত বিস্তারে
বারেবারে বাইরে ও ঘরে তোমার সুষমা
ছড়ায় উপমা। (ব. পঁ., পৃ. ৩৫৯-৬৬)

কবি 'আবিশ্বসমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণে'র ("শালবন") বেদনা ও সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করেন :

প্রচণ্ড শান্তির পর্বে সাম্রাজ্যের সন্ধ্যায় প্রত্যহ
জীবিকার মুষ্টি তোলে দেশে দেশে মৃত্তিকাসন্তান॥
(ব. পঁ., পৃ. ৩৭২)

কিন্তু যখন—

মুক্ত ঋষি কান্টের শহর
মুক্তি নামে স্লাভ দেশে দেশে
ঘরে ফেরে পোলিশ্ বহর
চীনবার্তা ব্রহ্মে এসে মেশে
ফ্রান্সে শুনি প্রাণের লহর
আবর্ত ভেঙেছে আজ হেসে।
("বৈশাখী", ধ. পঁ., পৃ. ৩৬৬)

তখন—

বাংলায় মারীর কবল,
অনাহার, মানুষের দল
চীরবাস, মরণের ছল
আড়তে আড়তে খোঁজে ভাষা। (ব. পঁ., পৃ. ৩৬৭)

এ দৈব নয়, কেননা 'পুরাণ বাতিল' ; এ দুর্ভিক্ষ মানুষেরই সৃষ্টি ; 'আমরা মানুষ, করি দোষ / আমাদেরই লোভ, দলাদলি'। তাছাড়া 'কল্কি আজ পৌরাণিক ঘোড়া / চড়েনা, ফ্যাসিস্ট সাজে আসে / দুর্ভিক্ষবাহন সোনামোড়া।' যেমন দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি তেমনি, কবির চোখে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শাসক ইংরেজেরই অপকৌশল। দেবতাদের ঐক্য ভেঙ্গে দিচ্ছে শয়তান ও তার বাহিনী, দেবতাদের মধ্যে গুপ্ত হত্যা সংঘটিত করে এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা অপপ্রচারের কৌশলে—এই ছবি "সর্গ হইতে বিদায়" কবিতায়। "হাসানাবাদেই" কবিতায় আছে :

জাগ্রত মুক্তির আভাস পেয়েই
রাক্ষসী রাণী বুঝি ভয়ে হল হিম—
মরণ কাঠি যে তার হাসানাবাদেই
এক হাতে ভাঙে শত রাম ও রহিম।। (ব. পঁ., পৃ. ৩৮৫)

"এঁরা ও ওরা" কবিতার উপসংহারে শাসক ইংরেজের পরিপ্রেক্ষিত :

গদিয়ান, তবু এ তো হল বড়ো জ্বালা!
হুম্‌কি তো দিই। কুস্তির নেই শেষ,
তবুও যায় না রাজার উপরে দ্বেষ!
অদ্ভুত দেশ, আমাদেরই বলে, পালা,
বলে নাকি, সুখীসচ্ছল হবে দেশ! (ব. পঁ., পৃ. ৩৮৬)

"ছড়া—২" কবিতায় :

বণিকরাজের বিষে
নীল হল দেশ, কাল-সাপ উষ্ণীষে। (ব. পঁ., পৃ. ৩৭৬)

অবশ্য ভুলছেন না : "কে জান্‌ত পোড়া দেশে এত বুলবুলি!" কখনো কখনো মনে হয় : "অরণ্যে রোদন শুধু, কঙ্কালেরা বদ্‌লিয়েছে ভেক্‌" (কঙ্কালীতলা, ঐ, পৃ. ৩৮১)। তবু কবির আস্থা সেই কিশোরের সম্ভাবনায়, যে দিগ্‌ভ্রান্ত নয় :

তোমাকে নন্দিত করি, হে কিশোর, তুমিতো ভোল নি
মত্ততায় বীর্য নেই, মল্লবীর অকালে লাফায়।
তোমার দুহাতে ছিল প্রলাপের বহু সম্ভাবনা,
বেঁধেছ মনের শৌর্যে, ···

কিশোরের সম্ভাবনায় কবির আস্থার কারণ :

মনুষ্যত্ব চোখে জ্বলে, একমাত্র ধনী দরিদ্রের
ভেদাভেদ মানুষের শত্রু যে তা তুমি তো ভোলো নি—
তুমি জ্বালো দীপাবলী অন্ধকারে ভীত বিনিদ্রের ॥
(ব. পঁ., পৃ. ৩৮১-৮৩)

কবি তাই মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুবিহীন আশার ছবি দেখেন :

মৃত্যুর পাশে জীবনের ভীড় বদ্ধমুষ্টি সঙ্ঘনিবিড়
("ভীড়", ব. পঁ., পৃ. ৩৮০)

"মৌভোগ" কবিতায় কবির সেই অভিলষিত চিত্র :

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লালনিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান। (ব. পঁ., পৃ. ৩৭৭)

'সন্দ্বীপের চর' কাব্যগ্রন্থে ঐক্যের ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে কবি আকাশ ও সমুদ্রের বিশালতাকে উপস্থাপন করেছেন :

১ জীবনের প্রকাণ্ড আকাশে (ব. পঁ., পৃ. ৩৬১)

২ শ্রাবণের ঢেউ ওঠে আকাশে কোথায়
প্রাণের জোয়ার (ব. পঁ., পৃ. ৩৮৪)

৩　জীবনের স্বচ্ছ আলোদীপ্ত নীল সাগরসঙ্গম (ব. পঁ., পৃ. ৩৯৪)
৪　　সাগরেরই গান করি,
সাগরমন্থনে মেঘের মৃদঙ্গ শুনি, মানসহৃদের
স্তব্ধ নীলে যাত্রা শুরু, দেশকালসন্ততিবিহীন গৌরীতে কেদারে
উন্মুখর মানসবলাকা,　　(ব. পঁ., পৃ. ৩৯৫)

বস্তুতঃ "সমুদ্র স্বাধীন" কবিতা বিষ্ণু দে-র এ-গ্রন্থের মূলবক্তব্যের সারসঞ্চয়, তাঁর অনুসিদ্ধান্তসহ। 'মন ও কলম'কে নদীর উপমায় রেখে নদীর তালিকা প্রণীত হয়েছে নানা দেশের প্রাণ প্রবাহরূপে :

এই মন ও কলম : এ যেন বা মহানদী, গঙ্গা বা কাবেরী
নর্মদা বা গোদাবরী, সিন্ধু বা শতদ্রু, তিস্তা বা যমুনা,
টেনেসির নদী, ভাবো ভল্‌গা, নীপার—
প্রাণস্রোতস্বিনী নদী, বিরাট জীবন
দীর্ঘ তটে তটে চলে প্রাচীন পৃথ্বীর
অতল মাটিতে জল ছলছল গতির কল্লোলে ;

সেই সঙ্গে কবিতাকে তুলনা করছেন 'খাল-কাটার' সঙ্গে—

কবিতা সে খাল-কাটা, গঙ্গার, তিস্তার,
কানানদী, দামোদর, আদিগঙ্গা, ময়ূরাক্ষী, মাৎলা, অজয়,
ভল্‌গা, নীপার কিংবা মস্কভাই, প্রাণের প্রণালী সব
চৈতন্যের পাথরে পাথরে ; মানুষের হাতে গড়া।

যেহেতু কবির বিশ্বাস—'সাম সত্য, সত্য সাম্যের সঙ্গীত' তাই তিনি মনে করেন :

এই আকস্মিকের পুতুল হিন্দু ও মুসলিম এদেশে ওদেশে
অতীত ও ভবিষ্যৎ মুক্তি পাবে অসীম সৈকত
এক সহস্র প্রাণের মুখর সাগরে ···

তাই কবির সংকল্প :

জীবনে জীবন গড়ি, শত শত খাল,
কলমে কবিতা গড়ি জীবনে কবিতা,

পরিণামে প্রতিশ্রুত সিদ্ধান্ত :

তবু জাগর জীবন সত্য হয় সবাই যে রাজা সেই রাজত্বেই
স্বপ্নাভাসে, স্বপ্নে ও জীবনে, দুই তটে উথলি' উছলি'
নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল উর্মিল
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে
সহিষ্ণু ঘটনাস্রোতে, রুদ্র সমুদ্রের, সংগঠন, স্বাধীন সমাজে
স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, জীবনের উন্মুক্ত পত্তনে
সমুদ্র স্বাধীন। (ব. পঁ., পৃ. ৩৯১-৯৮)

এ গ্রন্থের "মে দিন" কবিতায় উচ্চারিত প্রত্যয়ের প্রকাশ ঘটেছে মাত্রা-বৃত্ত ব্যবহারের সুমিত সাফল্যে এবং মিলবিন্যাসের সুদক্ষ স্বাচ্ছন্দ্যে :

মে-দিনের গান অক্ষয় প্রাণে
দুর্গত দেশে বঞ্চিত ত্রাণে
তোলে চৈতালী সুর

ওরা ভাবে ঢাকে কাল-বৈশাখী
মরণভিখারী শ্মশানের পাখি
মশানে পোড়াবে মেঘ

মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে
হে লালকমল হে নীলকমল
নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে
স্বর্ণলঙ্কা চূর

ওরা কি বাঁধবে সমুদ্রশ্বাস
বৈশাখী মেঘ ঝড়ের বাতাস
রুধ্‌বে বজ্রবেগ ?

মে দিনের গান কালবৈশাখী
ঝড়ে ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখি
মরণই মরণাতুর (ব. পঁ., পৃ. ৪০৪-০৫)

এ গ্রন্থের দুটি কবিতায় প্রেমে আস্থার কথা উচ্চারণ করেছেন কবি। "মধ্যবয়সী"তে আছে 'একাগ্রতাই সত্তা' এই অভিমত এবং এই স্বীকৃতি :

মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিন-আলো ছড়ায় আমার মনে।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার,
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে।
তোমার বাহুতে আমার জীবনস্মৃতি
দ্বৈত রচনা, গত-অনাগত প্রীতি। (ব. পঁ., পৃ. ৩৭৪)

"সহিষ্ণুতা"য় আছে দৈনন্দিনতা অতিক্রমী পূর্ণতাভিসার :

তোমাকেই দিই এই ক্লান্তির ভার
দীর্ঘ আয়ুতে উদ্বায়ু গত, ক্ষমা
তুমি ছাড়া কেবা করবে অঙ্গীকার ?
পূর্ণিমা তুমি, তোমাতে মেলাই অমা,
ঘৃণার আঁধার তোমাতেই প্রিয়তমা
সহিষ্ণু আলো জ্বালুক পূর্ণিমার।
... ...
তোমার সাগরে ছড়াই আমার ক্ষমা,
বাজারের কালো পাহারের গুরুভার,
ধুয়ে যাক্ আজ নীলে নীলে সে সুষমা
হৃদয়ে আনুক সাগরের দুর্বার
অতল ধৈর্য, ক্রান্তির উদ্ধার
সংক্ষেপে নয়, জানি আজ প্রিয়তমা ।। (ব. পঁ., পৃ. ৩৭৯)

একথা সত্য : 'সন্দীপের চরে'র "অধিকাংশ রচনাই একটি আর একটির পুনরাবৃত্তি। তবু সুদক্ষ কারিগরিতে এবং মানবিক মূল্যের অঙ্গীকারে, বর্তমানের যন্ত্রণার পাশাপাশি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে, মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার বলিষ্ঠ ইশারায় প্রত্যেকটিই স্বকীয়সার্থক।"[২৩] "কবি সমস্ত দুর্বিপাকের পরেও বর্তমান যন্ত্রণার অন্তপর্বে আশা করতে পারছেন সমাজ-নদীর তথা ব্যক্তি-নদীর মোহনায় এক ফালি নতুন জাগা চর, যেখানে জীবন সুস্থতর,

রৌদ্রস্নাত মাটির বুকে সংসার পাতবে নতুন যুগের কর্মিষ্ঠ মানুষ।''[২৪] বস্তুতঃ 'সন্দীপের চরে'ই বিষ্ণু দে সমকাল ও বাংলাদেশ সম্পর্কে আবরণমুক্ত স্বচ্ছতা এবং অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিজাত সচেতনতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একারণেই এ কাব্য গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থে কবি পৌনপুনিক-ভাবে বীরের সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন। কিন্তু ঘটনচক্রে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক-মহলে এ গ্রন্থ প্রকাশের অল্পকালের মধ্যে অসহিষ্ণুতা প্রবল হয়েছে। বিষ্ণু দে-র সমকাল ও কবিমানসের পরিপ্রেক্ষিত উপলব্ধির জন্য ঐ প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন এখানে প্রয়োজনীয়।

ফরাসী কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক নেতা ও লেখক রজে গারোদি, পিয়ের এরভে ও লুই আরাগঁ শিল্পসাহিত্য বিষয়ে এক বিতর্কের সূত্রপাত করেন। 'অরণি' পত্রিকার ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ সংখ্যায় 'সমসাময়িক সাহিত্য' বিভাগে এই বিতর্কের 'সংক্ষিপ্ত সার' ছাপা হয়।[২৫] ''শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারে রাজনৈতিক ফতোয়া বা নির্দেশ কিংবা শিল্পের সৌধের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির সমীকরণের যে সহজ ও সরল অভ্যাস মার্কসের রচনার মতই পুরোনো তার বিরুদ্ধে গারোদি (এবং এরভে) বলেছিলেন শিল্পসাহিত্যের আপেক্ষিক স্বাধিকারের কথা এবং বিশেষ এক অর্থে এমনকি বলতে চেয়েছেন, কমিউনিস্ট শিল্পতত্ত্ব বলে কিছুই নেই—শিল্প বিচারে কোন পার্টি লাইন বা মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়। লুই আরাগঁর রচনাকে দাঁড় করানো হল এই মতের প্রবল বিরোধিতায়।''[২৬] 'অরণি'র ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ সংখ্যায় ছাপা হয় গারোদির ঐ প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ, ''মূল ফরাসী থেকে'';—অনুবাদক বিষ্ণু দে, প্রবন্ধের বাংলা শিরোনাম ''উদ্দিহীন শিল্পী''। যেহেতু ''বিষ্ণু দে-ই গারোদির মতামত উপস্থিত করেছিলেন'' এবং যেহেতু বাংলার পার্টি লাইনে আরাগঁর মতামতই ''শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির কালাপাহাড়ী আধি-পত্য বা রুচির অদ্বৈতবাদের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল'',[২৭] সেহেতু বিষ্ণু দে পার্টি তাত্ত্বিকদের বিরাগভাজন হন। এরপর 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় ১৩৫৪ সংখ্যায় তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমারের—বিশেষতঃ অচিন্ত্যকুমারের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে ''গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা'' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ সংখ্যা

'পরিচয়ে' "নীহার দাশগুপ্ত 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প' প্রবন্ধে অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে বিষ্ণু দে'র মন্তব্যের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন।" তার জবাবে পরবর্তী সংখ্যায় (পরিচয়, পৌষ ১৩৫৪) "পাঠকগোষ্ঠী"-তে ছাপা হয় "শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প" শীর্ষক চিঠি। ঐ একই সংখ্যায় হিরণকুমার সান্যাল তারাশঙ্করের 'হাসুলিবাঁকের উপকথা' আলোচনা প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-কে আক্রমণ করেন। মাঘ সংখ্যায় "নীহার দাশগুপ্ত ও অনিল সিংহ বিষ্ণু দে-র চিঠিটি প্রসঙ্গে খুবই তিক্ত জবাব দেন। ফাল্গুন সংখ্যায় বেরোয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী চিঠি। ...ইতিমধ্যে এই সব ঘটনা ও মতা-মতের প্রতিক্রিয়ায়, বিষ্ণু দে 'অবজ্ঞামূলক মনোভাব ও উগ্র মতবাদের উদ্ধত যান্ত্রিকতায় সাহিত্যে প্রগতির ও প্রগতি সাহিত্যেরও সমূহ ক্ষতির সম্ভা-বনা'র কথা বলে (পরিচয় পত্রিকার) পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগের ইচ্ছায় চিঠি দেন। চিঠিটি ছাপা হয়নি কিন্তু ফাল্গুনী সংখ্যা থেকেই দেখা যাচ্ছে বিষ্ণু দে-র নাম পরিচালকমণ্ডলীতে নেই। এরপর দীর্ঘকাল বিষ্ণু দে পরিচয়ে লেখেন নি।"

এর প্রায় পাঁচ মাস পর, ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়, বিষ্ণু দে প্রকাশ করেন 'সাহিত্যপত্র', প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৫৫)। এই পত্রিকা প্রকাশ ছিল 'সরকারী সাম্যবাদী' মহলের শিল্পসাহিত্য-বিষয়ক 'সংকীর্ণতা', 'ঔদাসিন্য' ও 'অসহিষ্ণুতার' বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে-র সুস্পষ্ট প্রতি-বাদ। পত্রিকায় তিনি একই সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে "ডানের বিপদ ও বাঁয়ের বিপদ" তুলে ধরেন। ফলে 'সরকারী সাম্যবাদী মহল' এই পত্রিকাকে 'তৃতীয় শিবির' বলে চিহ্নিত করে এবং পার্টির তাত্ত্বিক নেতৃবৃন্দ নিজেরাই সরাসরি বিষ্ণু দে-র সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এই বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, বিবিধ পুরাণ ও লোক-সাহিত্যের উপাদানের বিপুল ব্যবহার বিষ্ণু দে-র বক্তব্যকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করেছে এবং বিষ্ণু দে আদৌ মার্কসবাদী কিনা সন্দেহ। এ সময়ের নানা লেখার মধ্যে দুজন প্রখ্যাত লেখকের অভিমতের কিছু অংশ এখানে উপস্থিত করছি।

ভবানী সেন :

> "সাহিত্যের কলাকৌশল সাহিত্যের মূলনীতি ও মূল উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সত্যবস্তুকে উপলক্ষ করেও

ভাবনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ কলাকৌশল সূক্ষ্মভাবে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব রক্ষা করে থাকে। তার প্রমাণ শ্রীবিষ্ণু দে'র কবিতা। তাঁর কলাকৌশল হল কাব্যকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবার বা জনগণকে কাব্য থেকে বঞ্চিত রাখবার কলাকৌশল। মার্কসবাদী বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশলের উদ্দেশ্য হল সাহিত্যকে গণমনের উপর প্রভাবশালী করা, সাহিত্যের সত্যকে গণমানবের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম করা এবং বক্তব্য-বিষয়কে সহজ সরল সুন্দর ও জোরালো করে তোলা। বিষ্ণুবাবুর কলাকৌশল ঠিক তার বিপরীত। প্রথমত তাঁর কলাকৌশল বক্তব্য-বিষয়কে সহজ ও সরল করে না, যতদূর সম্ভব দুর্বোধ্য ও জটিল করে তোলে। তাঁর কবিতাকে দণ্ডীর ভঙ্গী-কাব্যের মত ব্যাকরণ বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত তাঁর কলাকৌশল মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করে না বরং বাইরের বস্তু ও ভাবগুলিকে একটা অতীন্দ্রিয় রূপ দিয়ে ভিতরে টেনে নেয়, যা সহজে বুঝি তাকেও 'বুঝিনা'র পর্যায়ে ফেলে দেয়। তৃতীয়ত তাঁর কলাকৌশল ভাবের ঐক্য এবং শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে মনোরাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে। স্বপ্নে যেমন নানা বস্তু, নানা স্থান ও নানা কালের স্মৃতি টুকরো টুকরোভাবে একটা বস্তু, একটা স্থান বা একটা কালের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলভাবে জড়িত থাকে তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি ঠিক সেই রকম। ভাসা ভাসা অনেক গুলো বিবিধ আইডিয়া ঘোড়দৌড়ের মত একটা আইডিয়ার ওপর দিয়ে এমনভাবে দৌড়ে যায় কার সাধ্যি বুঝতে পারে কোন্ ঘোড়াটা কোন্ দিকে দৌড়োচ্ছে।

এই কলাকৌশল হল—বস্তুনিষ্ঠ নহে ব্যক্তিনিষ্ঠ, গণতান্ত্রিক নহে আত্মকেন্দ্রিক, গঠনমূলক নহে অরাজক। এ কলাকৌশল হল বুর্জোয়া ভাব ধারার দৈন্য ও অরাজকতা থেকে উৎপন্ন। এর সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

বিষ্ণুবাবু একজন দক্ষ কলাকৌশলবিদ কিন্তু মার্কসিস্ট নন। তাঁর কলাকৌশল মার্কসবাদকেই হত্যা করে।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, বিষ্ণুবাবুর গলদ শুধু কলাকৌশলেই। কলাকৌশল তাঁর ভাব ধারাকেও বিকৃত করে

দিয়েছে, অথবা তাঁর ভাবধারারই প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হল তাঁর কলাকৌশল। তাঁর কবিতায় বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, জনগণ, ধর্মঘট, তেভাগা—এসব সত্যকার মানুষের সত্যকার সংগ্রাম নয়, এসব হচ্ছে কতকগুলি আধ্যাত্মিক আইডিয়া, উপকথার লালকমল আর নীলকমলের মত প্রহেলিকা, মনের একটা আলোড়ন, ভাবের একটা রঙীন নেশা। পাতঞ্জলির সাংখ্যদর্শনের মত 'বস্তু'কে তিনি 'প্রকৃতি'তে পরিণত করেছেন। ভাববাদের এক মহা সংকটের সময় শঙ্করাচার্য যেমন অদ্বৈত বেদান্তে বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই তাকে মায়ায় পরিণত করেছিলেন, বিষ্ণুবাবু তেমনি বস্তুজগতের প্রকৃত সংগ্রাম ও সমস্যাকে মায়াময় করে তুলেছেন। উদাহরণস্বরূপ :

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কতো না পারুলরাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হল পার!
বিরাট বাংলাদেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

স্বাধীনতা বা গণবিপ্লব কবির নিকট প্রকৃত মানুষের প্রকৃত জীবনের ব্যাপার নয়, চম্পার মত এক রঙীন ফুল, কল্পলোকের এক অতীন্দ্রিয় সত্তার পার্থিব মূর্তিতে আবির্ভাবের সুদূর সম্ভাবনা। বাহ্যত আশাবাদী হলেও এটা নৈরাশ্যবাদীর সুর, বাহ্যত বস্তুতান্ত্রিক হলেও আধ্যাত্মিকতা।...

বিষ্ণুবাবুর এই কবিতা কোন সত্যকার জঙ্গী মানুষ বোঝে না, তিনি নিজেই বোঝেন, নিজেই উপভোগ করেন। "জঙ্গী" কোন সত্যকার সংগ্রামের কোন সত্যকার সৈনিক নয়, বিষ্ণুবাবুর মনের একটা আইডিয়া, তাঁর চম্পার একটা পাপড়ি, তাঁর "বস্তুতান্ত্রিক" অধ্যাত্মজগতের একটা সত্তা। এর ভিতরও ফুটে বেরুচ্ছে "মূহ্যমান" নৈরাশ্যবাদীর "হৃদয়ের অনশ্বর রেশ"। অন্যত্র কবি বলেছেন :

প্রেয়সী, যখন তূর্য ভাঙবে তোমার ঘর,
জানি সে বিদায়ে ঘর ও বাহির দ্বন্দ্বহীন,

বিজয়ী প্রাণের দীপ্তি নয়নে, গভীর স্বর,
তোমার মধুরে নীড় উভয়ত ছন্দলীন।
বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে,
ভাবী সমাজের অজেয় ইশারা তোমার গানে।।

ভাবী সমাজের ইশারা জীবন্ত নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামে নয়, একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে পাওয়া যায়; এই হেঁয়ালিবাদই হল বিষ্ণুবাবুর 'বস্তুবাদের' ফিলজফি। এর সঙ্গে মার্কসবাদী 'বস্তুবাদের' কোন সম্বন্ধ নেই, এ হল মুমূর্ষু ধনিক সমাজের অল্প মধ্যবিত্তের 'বস্তুবাদ'।

বিষ্ণুবাবুর কলাকৌশল ও দর্শন উভয়ই ক্ষয়িষ্ণু ধনিক সমাজের ক্ষয়ের পরিচয়। কাব্য জগতের এই ক্ষয়িষ্ণুতা ও দৈন্য প্রগতির পথে এক বিষম বাধা, প্রগতির ছদ্মবেশে এই ক্ষয়িষ্ণুতা প্রগতির পথরোধ করেছে।[২৮]

প্রদ্যোৎ গুহ :

আজকের সামাজিক সত্য হল এই যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অন্তিমকাল উপস্থিত। বিপ্লবের শক্তি সংহত। আর আগামীকালের প্রাণস্পন্দন হল বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ। (না, 'অবান্তর আশার দ্বারা উত্তেজিত করা' নয়—এই সত্য) বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের পক্ষে এই সত্যকে রূপ দেওয়ার অর্থ নিজেদের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করা। সেই জন্যই তাঁরা আজকের সামাজিক সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করেন। তাঁদের 'ফর্ম' তাই সত্য গোপনের ফর্ম। এই ফর্মের চটকদার নামাবলী পরে তাঁরা নিজেদের দেউলিয়াপনাকে ঢাকবার চেষ্টা করেন। একথা বিষ্ণুবাবুর কবিতা সম্পর্কেও সত্য। একটা সর্বাধুনিক নমুনা দিচ্ছি :

বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই, প্রাণ এক ছিটে
না জানি কি অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্নুর মন্ত্রণা
স্বর্গহীন লুসিফর, বিলজেবর ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা
থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে, কাঁকরে, অভ্রে, লাইনে গ্রানিটে

নিরন্ন নিরস নগ্ন, শুষে খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ;
একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটেরও আভাস
শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস
(সাহিত্য পত্র, শ্রাবণ ১৩৫৫)

এ-কবিতার যদি কোন বক্তব্য থেকে থাকে—তা নৈরাশ্য। পাছে জনসাধারণ বিষ্ণুবাবুর এ নাকি কান্না গ্রহণ না করতে পারে এই জন্যই বিষ্ণুবাবু ফর্মের দেয়াল তুলে আত্মরক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই ফর্ম অ-গণতান্ত্রিক।[২৯]

এই প্রত্যক্ষ আক্রমণের সূত্রে, মার্কসবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সংকট-প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র 'অভিমতে'র কিছু অংশ এ-রকম :

১ এতদিন মুখ্যত একপেশে শিক্ষার প্রভাবে, আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ইংরেজী শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংস্কৃতির অপরিসর চলনবিলেই মার্কসবাদের সংস্কৃতি চিন্তা মোটা-মুটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

২ মুশ্‌কিলটা আরো বেশি হয়ে পড়ে যখন এই একপেশে মার্কসবাদের প্রয়োগ হয় সাহিত্যবিচারে।...
এ বিচারে ব্যাপক ইতিহাসের সংক্ষেপ বিদ্যার ছাড়াও বিশেষ শিল্প সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ, বোধ বা যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবও প্রায় দেখা যায়।

৩ মার্কসবাদী এখনো সাহিত্যনিষ্ঠার পরিচয় হয়তো দেননি, কবিতা তিনি অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেন, রূপকথার জগৎ তাঁর চক্ষু থেকে বাদ দেন, এবং এক্-এক্ কামানের গানের শ্লোকে জঙ্গী কর্মীকে না পেয়ে হতাশ হন। নিকৃষ্ট মার্কসবাদীরা আবার আলোচনায় নেমে, কটুকাটব্য গালিগালাজকে ভাবেন ডায়েলেকটিক্স, বাক্যের অপব্যাখ্যা করেন, প্রতিপক্ষকে অসম্পূর্ণভাবে বা মিথ্যাভাবেই উদ্ধৃত করেন, বোধের ও জ্ঞানের অভাবকে ঢাকেন অন্ধের আত্ম-ম্ভরিতায়।[৩০]

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিষ্ণু দে লেখেন 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০) কাব্যের প্রথম কবিতা "অন্বিষ্ট"৩১। এই কবিতায় তিনি বলেন কর্মী-মার্কসবাদীর যা অন্বিষ্ট কবি-মার্কসবাদীরও তা-ই অন্বিষ্ট। কবির ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কবিতাটির প্রথমাংশে তাঁর উচ্চারণ :

আমারও অন্বিষ্ট তাই

আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক্ স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্ণা
সহাস জীবনে এনে দিক
সহজ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সরল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙীন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সদ্য ও সজাগ

কর্মজীবী মানুষের 'অমর প্রাণে'র জাগরণ, "মানুষের ইতিহাসে উদ্ভাসিত ঝঞ্ঝাময় চেতনা" কবির অন্বিষ্ট :

সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভাল লেগে লেগে
আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।

আকাশের উপমায় জীবনের সম্ভাবনা ও মানবিকতাকে দেখেন বলে কবি বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত :

তাই তো নিশ্চয় জয়
তাই তো অমরলোক রূপনারাণের পায়ে এই মর্ত্যলোকে

কবির চোখে ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন অনিবার্য :

দু'চোখে তো উন্মীলিত স্বপ্ন এক, তাই বর্তমান
দিনরাত্রি জেলে চলো ভবিষ্যতে—বিনিদ্র নির্মাণ।

তাই কবির আহ্বান :

ঘরে ও বাইরে তুমি জেলে দাও আলো অনির্বাণ,
ঘরেরই প্রদীপ আনো, জ্বেলেছিলে যে শিখা দুটিতে
সে আলোয় দীপাবলী, দূর দূরান্তর সে সংগীতে
উন্মুখর উদ্ভাসিত চিত্তে চিত্তে উন্মোচিত গান
জীবনের বসন্তের নির্মাণের ঘরের স্বপ্নের গান গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।

লতিকা সেনের আত্মদানের মধ্যে কবি দেখেন 'নিখর দেহ প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী'-কে ; শোনেন 'সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।'

কবিতাটির দ্বিতীয়াংশে শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিনতা। 'ওদের' রুজির সংঘাতে বলিষ্ঠ যাত্রাপথেই স্বাধীনতা ও শান্তির 'কাওয়াজ' :

তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে
মেঘে মেঘে কলিজার প্রচণ্ড আবেগে রুজিতে বাঁকানো বেগে
সূর্যে সূর্যে মুঠি মুঠি দিন।

... ...

গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে ঘরে হাতে হাত খামারের পাশে
ওরা চলে প্রবল গর্বিত সারে শান্তির কাওয়াজে আকাশে পাখির মতো

... ...

ওরা চলে সমুদ্রের চালে পাহাড়ের বেগে একমনে
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া দুই দুই কিতারে কিতারে

কবির প্রশ্ন :

ওরাই কি ছিঁড়বে দিন একঘেয়ে রাজপথে
এনে দেবে জীবনের সমুদ্র-পর্বত
সূর্যে সূর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
নামাবে প্রাণের স্রোত সদ্যধোয়া চলে
নতুন ফসলে
কাজের বিরস দিন ক'রে দেবে বৈশাখের মেঘ
রচনার দিন···
ঘরে ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর?

এ প্রশ্নের জবাব ইতিবাচক বলেই 'কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়' ঐক্য প্রতিষ্ঠাই কবির অন্বিষ্ট :

পিছনে নরকযাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি
নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে
হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়
যেন মিলে' যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ
দুর্দম প্রাণের বহ্নি জ্বেলে দাও তুমি
আমার এ অন্ধকারে উদ্যত প্রদীপে।

এই প্রত্যয়ী আশাবাদ সত্ত্বেও কবির উদ্দেশ্যে কর্মীদের অবজ্ঞাপূর্ণ সমালোচনার যেন শেষ নেই। সেই কঠোরতায় ঈষৎ বিচলিত কবি যেন কৈফিয়তের সুরে বলেন :

আমাদের হাত জীবনের চতুরঙ্গে
নেহাত মন্দ সঙ্গতে তাল দেয়নি—
এও তো সাধনা, নাইবা হলাম সংবাদ।

সংসারী কবি হয়ত নামেননি কর্মীর ভূমিকায়—একথা উল্লেখ করেও ভবিষ্যতে তাঁর আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেন :

সাহস হয়ত কমই, ছাড়িনি কো সংসার,
কঠিন ব্রতের কবচ বাঁধিনি হৃদয়ে,
ত্যাগ সামান্য, কর্মীও নই, তাও ঠিক,
তবুও জীবন এ বীরভোগ্য জীবনে
বহু উপভোগ করেছি তো—জানি দাবি নেই,

শুধু টলোমলো শ্রাবণদীঘির কল্লোলে
আস্বাদ পাই ভবিষ্যতের মোহনায়।
শুধুই জানাই শাল অরণ্যে পলাশের
গ্রীবায় বাহুতে আগুন-রাঙানো ফাল্গুনে
——আমাদেরই সন্ততিদের সেই অধিকার।

এরপরও কবির উদ্দেশ্যে কটূক্তি থামেনা। কবি পাঁচটি স্তবকে তাঁর সেই পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। প্রতিপক্ষকে বর্ণনা করেন 'বিজ্ঞ' বিশেষণে। কবির সকল প্রয়াস সম্পর্কে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষের অভিমত প্রতিস্তবকের শেষে উপস্থাপিত। কবি প্রেমের কথা বললে :

বিজ্ঞ বলে, এ ছলনার জাল,
বলে, অসৎ স্বপ্ন-দেখা চাল।

কবি দেশ-কাল-ইতিহাসের পটে জীবনের কথা বললে :

বিজ্ঞ বলে, এ বুর্জোয়া চাল।

কবি রচনা করেন অজেয় প্রাণের ভাষ্য, তাই উপেক্ষা করেন 'বিজ্ঞে'র কুৎসা :

বিজ্ঞ বলে বলুক্ না দালাল।

কেননা কবির বিশ্বাস :

কুৎসা শুধু কুয়াশা, হবে ভোর
উষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।...

যদিও :

তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে
বিজ্ঞ বলে কত কী মূঢ় রাগে।

দৃঢ় প্রত্যয়ে ও প্রেমের শক্তিতে কবি সব কিছু অতিক্রম করে যাবেন এবং তথাকথিত বিজ্ঞ জমিয়ে তুলবে শুধুই জঞ্জাল :

তোমার ছবি গড়েছি নীলে রবি
অন্ধকারে উষার ভৈরবী
তোমার দানে আমার অভিযান
তোমারি প্রেমে সাধনা অম্লান
তোমার হাওয়া সাগরে তোলে পাল···
বিজ্ঞ ঘাটে জমায় জঞ্জাল।

এই প্রত্যয়ী উচ্চারণের পর কবি তাঁর প্রিয় রূপকথা-প্রসঙ্গে ফিরে যান। সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, বন্দিনী রাজকন্যা ও কাঠকুড়োনীর ছেলের কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। রাজকন্যা ও কাঠকুড়োনীর ছেলে দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি কিন্তু কাঠকুড়োনীর ছেলের প্রতি ভালবাসায় তাঁর রাজকন্যা শ্রেণী অতিক্রম করে যায়—"হৃদয়ে যে তার আগুনে মেলায় শ্রেণী"।

শেষপর্যন্ত কবির উদ্দেশ্যে কুৎসা-প্রচারক কর্মীর প্রতি কবি ক্রুদ্ধ নন, হয়ত বিমূঢ়। তবু সেই বিমূঢ়তা কাটিয়ে বীরকে তিনি আহ্বান জানান :

তোমার সময় নেই, চলো তুমি ঊর্ধ্বশ্বাস রথে
জয়যাত্রা পূর্ণ হোক। জেনো বীর এ যাত্রা বিরাট
বিস্তৃত ক্রান্তিতে চাই বহুবিধ কর্ম পানিপথে
আমরাও আছি জেনো তোমাদেরই কমিশরিআট্।

কিবা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মণ্ডূকভাষ্যের
তত্ত্বকথা কিংবা মূঢ় মাৎসর্যের বর্জননীতিতে
অভিযান লক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা শত্রুরই হাস্যের
খোরাক। আকাশ ছেঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে।

স্মর্তব্য, কবি বারংবার জীবনকে দেখেছেন আকাশ আর সমুদ্রের উপমায়। সেই বিরাট জীবনের আকাশ ছেঁটে কেবলই মাটিতে নীড় রচনা কোন কবি বা কর্মবীরের লক্ষ্য হতে পারে না। তাই কবির পুনশ্চ আহ্বান :

সারথি! ঢাকে না যেন জীবনের ঊর্মিল আকাশ
জীবনে জীবন এনো দ্বন্দ্বে এনো সত্তার আভাস।

তৃতীয়াংশের উপসংহারে বিষ্ণু দে 'প্রবল সাহসে প্রচণ্ড আশার অন্ধ দুরন্ত আক্রোশে' নবজীবনের উজ্জীবন কামনা করে যে 'তরুণ কুমার' মাথা কুটে মরছে তার সঙ্গেই যেন কবির তুলনা করছেন ; বলছেন :

সে তো নয় অপরাধী চোর কিংবা খুনী
সে শুধু প্রচণ্ড আশা ধরে
সে তো শুধু ভাষা খুঁজে মরে
সে তো শুধু রূপ দিতে চায় জীবনে জীবনে হাটে বাটে ঘরে ঘরে
জীবনের নূতন বৎসরে।

কবির সাধনা হয়ত 'শানে মাথা কোটা', তবু তার আশা-প্রত্যাশা প্রত্যক্ষ :

তাইতো সে শানে
মাথা কোটে যদি তার আর্তনাদে
যদি তার যন্ত্রণার ঘোঁটে ঘৃণার নির্ঝরে
পাষাণে পাষাণে প্রাণ জেগে ওঠে মহীয়ান
মৈত্রীর সংবাদে ক্ষেতে মাঠে মিলে মিলে মিছিলে মিছিলে।

এ-ভাবেই বিষ্ণু দে নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ের আলোকে কবি ও কর্মীকে এক অন্বিষ্টে মিলিয়ে দেন, ডাকেন 'আত্মদানে কর্মে গানে'।

কবিতাটির চতুর্থাংশে বিশেষভাবে শিল্পের—সৃজনশীলতার প্রসঙ্গ। 'শিল্প আজ দুঃস্থের সংবাদ' ; উপরন্তু বিজ্ঞ এসে 'মূর্তি ছবি' নিয়ে যায়, 'লেখে প্রত্নের বিবাদ'। প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য বিচারের অসার তর্ক ব্যতীত সৃজনশীলতাহীন কালে গ্রামীণ লোকের সাহায্যে হতেও পারে শিল্পের

নব-উন্মেষ। অর্থাৎ তাত্ত্বিক-তর্কে নয়, লোকজীবনে খুঁজতে হবে নবসৃষ্টির উৎস। 'ভূমিসাৎ মননের দৃঢ় বর্তমান'-এ—

অবিরাম হানা দাও একান্তে সত্তায় তুমি
প্রাকৃত, অবুঝ,
স্মৃতির শিকড়ে নিত্য
জীবনের পরাগে পরাগে অনিবার্য হাওয়ার মতন।

কবি নিয়ে আসেন পিকাসোর গের্নিকার প্রসঙ্গ; যেখানে 'ধ্বংসেই বাসর'। পিকাসোর ছবিতে সমকালের বধূ-প্রতীক সেই 'সুন্দরী তন্বী'— 'শতধা যে হাজার মুকুরে,' 'ছিন্ন ভিন্ন উরুবাহু হাত'; শিল্পী গেঁথে যাচ্ছেন 'শ্মশানে কবরে' 'মৃত্যুহীন সাতনরী প্রাণ':

যুদ্ধে যুদ্ধে ঘর বাঁধা করুণার মাধুর্যে নির্মাণ
বিপ্লবীর তীক্ষ্ণ রূপান্তর।

এই রূপান্তর-প্রত্যাশী কবি পুনরায় দেখেন 'নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক'; এই সৃজনশীলতার নদীর 'দুই তট উন্মুখর এক স্রোতে' এবং এ-নদী সমুদ্রাভিসারী:

বালিতে পলিতে বানে
ঘাটে ঘাটে ডেকে ডেকে চর রেখে রেখে
সঙ্গীত দ্বান্দ্বিক।

তবুও 'আশঙ্কার···আকাল' আসে, 'সন্দেহ বিদ্বেষ অপঘাত' আসে; প্রশ্ন জাগে একি 'ক্ষণিক পল্লব'? 'নিঃস্ব মানসের হৃদে নামবে আবার বৃষ্টি গলবে তুষার।' সেই প্রত্যাশাতেই জেগে থাকা। 'যুগান্তের কখন কি কল্পে' সে-প্রত্যাশা পূর্ণ হলেই:

শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা, সাবালক, মানবিক, মানুষের
আপন স্বভাবে।

কবি দেখেন, পিকাসোর ছবির মতই, বিটোফেনের সঙ্গীতে তাঁরই অনুরণন। তাই কবিকে (নিজেকেই) তিনি বলেন:

চাইনা তোমার কাব্যে দ্রুতলভ্য মিল।
... ...
চাই না সংসারে বন্দী আপাতপরার।

কবি চান :

দীপাবলী হোক পরিগ্রাহী শ্রেণীবন্ধহীন দীর্ঘকণ্ঠস্বর নেরুদার
দীর্ঘমাত্র অমিত্রাক্ষরের।

প্রত্যয়ী কবি জানেন :

অতন্দ্র জীবন ব্যেপে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা।
(ব. পঁ.. পৃ. ২৮৯-৩১০)

'বিস্তৃত' 'দীর্ঘ' অতীত আছে, কিন্তু কবির অন্বিষ্ট 'পাহাড়ে' ও 'মানুষে' লভ্য 'মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোধে' 'সেই ভবিষ্যৎ'। বস্তুতঃ অতীতচারিতা নয়, ভবিষ্যৎ নির্মাণই বিষ্ণু দে-র অন্বিষ্ট।

"১৪ই অগস্টে" কবিতায় গ্রাম শহরের বৈপরীত্য আছে, আছে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বোত্তরণের আকাঙ্ক্ষা ; আর তাঁর দীর্ঘ কবিতার স্বভাবে অন্ততঃ তিনটি স্বতন্ত্র বক্তব্যের আপাত অসংলগ্ন সহ-অবস্থান। উল্লিখিত দুটি প্রসঙ্গ ছাড়া আছে প্রথম পাঁচটি মাত্রাবৃত্ত স্তবকে প্রেমের কবিতা লেখার 'অপ-বাদের' কৈফিয়ৎ। অবশ্য 'তনু প্রান্তর', 'হৃদয়ের দীঘি,' 'হৃদয়ের মাঠ' —এ-সব প্রয়োগে প্রেমের সমর্থন অপেক্ষা ব্যঙ্গই সোচ্চার। উপরন্তু, কবি যার কথা বলেন তাকে সমালোচক যে চিনতেই পারছে না—এ-কথা বলে পঞ্চম স্তবকের শেষ চরণে উচ্চারিত হচ্ছে এই ঘোষণা : "চেনো না এখনও, তাকে আমি চেনাবই" (বহুর পঁচিশ, পৃ. ৩১১)। কবিতার অচিহ্নিত দ্বিতীয়াংশ গদ্য কবিতা ; এখানে গ্রাম শহরের বৈপরীত্য নির্ণীত প্রথমে শহরের পটভূমিতে। শহরের মেলায় গ্রামের মেলার মত উদার আকাশ, মাঠ, নদীর ঘাট নেই ; আছে "মুনাফায় ঘেরা / দুর্গন্ধ মেলায় হাজারে হাজারে / দেশের লোকের ভিড়"। এই শহুরে মেলায় গ্রামের সাধারণ মানুষ যেন হারিয়ে যাওয়া "উদ্ভ্রান্ত শিশু"; তারা "এ ওকে শুধায়, ভাই একেই কি

মেলা কয়? বাবুদের মেলা?'' কবি এরপর এই গ্রামের কর্মজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন; ''অনিষ্ট'' কবিতার রবীন্দ্রানুসারী 'ওরা'[৩২] সর্বনাম সরে গিয়ে পরিচয় জেগে উঠছে 'আমরা' এই আকাঙ্ক্ষায়:

আমরা ভেনেছি ধান, আমরা ভেঙেছি গম
জোয়ার বাজরা আর সর্ষে অড়হর
আমরা তুলেছি পাট আমরা বুনেছি শাড়ী গড়েছি পাথর
আমরাই ধরি হাল
আমরাই করি গান

এরপরই গ্রামীণ 'আমরা' রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে 'সকল মানুষে'র ঐক্যে, কবির বিশিষ্ট চৈতন্যে, 'জীবনের স্বাধীন আকাশে'র কামনায়:

আমাদের পৌরুষের গান
মানুষেরও, মানুষেরই
জীবনের আমাদের ব্যথার ব্যথী যে
আমরা সবাই নিজে সকল মানুষ মারা মানুষেরই বিরাট জগত
তারায় তারায় বাঁধা সূর্যে সূর্যে অণুতে অণুতে
চলিষ্ণু মুক্তিতে দীপ্র আমাদের জীবনের স্বাধীন আকাশ!

সৃজনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে ফিরে যেয়ে শ্রমজীবী ও কবি-শিল্পীর একাত্মতার অনুভব জেগে উঠছে। শ্রমজীবী মানুষ আকাশকে 'বাহু বন্ধনে' বেঁধেছে, সমুদ্রে ধরেছে হাল, হল কর্ষণে পাহাড়কে করেছে সমতল, এই শ্রমজীবী মানুষই কবি এবং কবিই শ্রমজীবী:

আমরাই কবি
আমরা খোদাই করি গান করি আমরা পটুয়া,
প্রেমিক, দোসর, মানুষের ছবি, মিল, হাজার বিন্যাস, তালে তাল
মুক্তির সম্বন্ধপাতে ঘনিষ্ঠ স্বাধীন
সৃষ্টিময়

শ্রমের সৃজনশীলতাসূত্রে এই ঐক্য-প্রস্তাবের উপসংহারে উচ্চারিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র:

তাই যদি হয় তাই হোক হার মানিনি কখনো।
আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক
চাষী ও মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা
রাত্রি আজ করে দিই দিন তুড়ি দিয়ে শনিকে রাহুকে
হাতে হাতে মাটির সন্তান সব অমৃতসন্তান বুকে আশা
মুখে মুখে জীবনের ভাষা . . .
আমরা স্বাধীন। (ব. পঁ. পৃ. ৩১১-১৭)

কবিতাটির তৃতীয়াংশে, পাঁচমাত্রার মাত্রাবৃত্তের চার স্তবকে, ইংরেজ শাসনা-বসানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার 'কাঁটায় ফুল' তুলে 'স্বপ্নে' 'মৈত্রী আর ঐক্যের' 'কর্মসূচী-মালা' গাঁথার কথা বলছেন কবি : 'মেতেছে মিলে হিন্দু-মুসলিম'; এমনকি এই সরল বিশ্বাসেও আন্দোলিত হচ্ছেন তিনি : "সোনার দেশ কোন-ই ক্লেশ নেই"।

কিন্তু সমকাল কবিকে এই নির্দ্বন্দ্ব উপসংহারের প্রশান্তি দেয়নি, তাই পৌনপুনিক অন্বেষা ও দ্বন্দ্বক্ষত :

১ ঘুরেছি অনেক ভিড়ে, অনেক নির্জনে ফিরেছি তো,
চেনা সেই অন্বিষ্টের তবু আজও দেখা নেই ;
('ঘুরেছি অনেক', পৃ. ৩২০)

২ কর্দমাক্ত বর্তমান ভবিষ্যে বিহঙ্গ সামুদ্রিক ('বিহঙ্গ সামুদ্রিক',পৃ.৩২১)

৩ তবু বৈশাখী কথা রাখে নাকো, তবু অভিসারে ভুল।
তমালের ডালে ঝুলাই হৃদয়, ঘাটে মড়কের বাসা। ('রামধনু', পৃ.৩২৩)

৪ সেদিনও তাদের গবেষণা বৃথা, আজও বৃথা পথে খুঁজি।
(ঐ, পৃ. ৩২৩)

এই অন্বেষা ও দ্বন্দ্বক্ষত নিয়ে কবি বার বার বিশ্বাসে ফিরে আসতে চান :

হে চক্রবাক্ হে আমার যৌবন!
জননী জন্মভূমিতে মানুষ মন॥ ('এক জলসায়', পৃ. ৩২৬)

'অবিচ্ছিন্ন কাব্যে' নিজেকে তিনি সেই আগামীকালের কবির একজন ভাবেন, যাঁর প্রেম ঘরে ও বাইরে এক এবং প্রিয়াকে যিনি 'বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে' বাসা বাঁধতে আহ্বান জানান :

সুতরাং নাও একটি কবির স্বীকৃতি
ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরণী,
বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে,
তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসি কাঠ,
নয়নে ঘনায় ছায়া স্বদেশের জনগণ,
আমি একজন সেই আসন্ন কবিদের ॥

দেখেন তিনি 'ভিড়ে'র নানারূপ :

ভিখারীর চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর
বৌমানুষের বিধবার আর ত্রিকালদর্শী শিশুদের চোখ
ঘরহারাদের, কারখানাছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের
যেন লাখো লাখো চোখে অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত।

আকালের ভিড়, দাঙ্গার ভিড়, বঙ্গভঙ্গ স্বাধীন ভারত
ট্রেড্‌মার্ক ভিড়
আর প্রতিবাদী ছাত্রের ভিড়, ছাঁটাইয়ের ভিড় ধর্মঘটের
ধর্মধ্বজের প্রতিবাদে ভিড়, দুস্থের ভিড়,

এই সব 'ভিড়' কবির কাছে 'স্বপ্নের ভিড়' বলে প্রতীয়মান হয় : "স্বপ্নের ভিড়ে শত রাজপথ শত শত ঢেউ চোখে চোখে নামে।" এবং "স্বপ্নে আজ চেতন অবচেতন / যুক্তপাণি, মনে জীবনে দ্বন্দ্ব / রক্তে তবু নীল গোলাপ বন।" (ব. পঁ., পৃ. ৩২৮-৩২)

জীবনের দ্বন্দ্ব ফিরে আসে 'শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্বে'; তাঁর চেতনায় শিল্পী-কবিই জানেন দ্বন্দ্বের প্রকৃত তাৎপর্য :

শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে
দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ; জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর,

তাই পুনরাবৃত্তি করেন কবিতার নির্মাণ ও প্রয়োজনের প্রসঙ্গ :

> কাব্যের যমক, অনুপ্রাস, উপমা ও উৎপ্রেক্ষাই
> যে দাবি জানাতে হবে, যে জুলম বন্ধ করুনে হাঁক
> সে দাবি কবিতা, সেই জুলুমের জ্বালানি আমরা
> সবাই, মানুষ, শিল্পী, কবি। (ব. পঁ., পৃ. ৩৩৪-৩৫)

এই অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতেই বিষ্ণু দে তাঁর 'প্রেম'-কল্প আবেগকে বারবার জনতায় ও নির্জনতায় দোলাতে থাকেন। "পঞ্চবটীর' পাঁচটি কবিতার প্রথমটিতে মালিনীই ফুল ; তৃতীয়টিতে সংশয় : 'জানিনা, তোমাকে হয়ত বা ভুল জানি' এবং শেষটিতে "তোমার মালাটি আজ নিয়ে যাব আমাদের ঘরে"—এই সম্ভাবনা।

পরবর্তী কালেও বহু কবিতায় 'শিল্পী' সম্পর্কে কবি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। যেমন 'আলেখ্য' (১৯৫০) কাব্যের "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" কবিতায় আছে মাটির সঙ্গে আকাশকে মেলাবার প্রয়াস। মেলাতে চান মাটিতে শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিনতা আর 'আকাশের সাম্যের সুযোগ'। সকল কিছুকে ব্যাপ্ত করে আছে যে আকাশ তার সঙ্গে কবি তুলনা করছেন 'সাম্যে'র—যা সবাইকে স্পর্শ করবে। তাই 'জীবনের অসীম প্রমাণ' রূপে উপস্থাপন করেন 'কর্মিষ্ঠ জনতা'কে ; যে-কোনো সাধারণ লোক হিসেবে নয়—কর্মী, শ্রমজীবী মানুষ হিসেবেই তিনি 'জনতা'কে দেখেন ; এই 'জনতা'ই তাঁর কাছে 'দেশের অসীম প্রমাণ'। অবশেষে 'আকাশে মাটিতে গড়ি ভিটে'[৩৩] এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে 'সাম্য'-বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেন ; এ-আঙ্কিক কোন ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে যুক্ত মানবিক অনুভব ও চেতনা।

'আলেখ্য' কাব্যের 'তাই শিল্পে' (বহুর পঁচিশ, পৃ.১৮৬) কবিতায়ও আছে জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রসঙ্গ : "তাই শিল্পে সত্তা শুদ্ধ, তবু জানি জীবনই আকাশ"। কবিতার শেষ চরণে উপসংহারের ভঙ্গিতে কবি বলেন : "শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে।"

শিল্প কবির প্রার্থিত কিন্তু এ শিল্প-চেতনা কখনোই 'নন্দনসর্বস্বতা' নয়। "স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত' কাব্যের "বরিস্ পাস্তের্নাক-কে" কবিতায় তাঁর বক্তব্য :

এ নন্দনসর্বস্বতা অসমৃদ্ধ অন্ধতাই, এতে নেই পূর্বাপর,
পৃথিবীর মানদণ্ড, এ দ্বৈতে অদ্বৈত নেই, এ একে আরেক নেই,
একচক্ষু গবাক্ষে তো মনের আকাশ নেই, বিকাশ বিলাসে রুগ্ন,
বিলাস বিকারে। একলঘেঁড়ের এ খোঁয়াড়ে কোথা কারো চাবি?
আত্মহা ও তত্ত্বের ছলায় শিল্প শুধু পথে পথে খেউড়, প্রলাপ।
প্রকৃতি-মানুষে আর মানুষে মানুষে ভেদ অবশ্যম্ভাবী।
কুৎসিতের স্থিতাবস্থা চেয়ে কানা শিল্পে মহাপাপ।
(ব. পঁ., পৃ. ৩৮)

এর বিপরীতে শিল্প ও শিল্পীর সফলতার মানদণ্ড কবি তুলে ধরেন 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' (১৯৭৩) "আহা! তখনই তো শিল্প মুক্ত" কবিতায়:

অথচ মনন চায় বিদগ্ধ সভ্যতা নিষ্কম্প-নিবাত,
চায় এই অনিকেত অসম্পূর্ণ সমাজের এ শিকল
ছিন্ন হোক সত্য চায় খণ্ডিত মনের গ্লানি, এ কলুষ
দীর্ণ, চূর্ণ ফেলে দিক অতলান্ত নীল ভঙ্গিল তরঙ্গে।

আর, বিশ্বের মানবলোকে সংহত করবে তার পেলব-পরুষ
—স্বার্থে আর স্বার্থের উত্তীর্ণ অর্থে; সৌন্দর্যে ত্রিভঙ্গে
এক বিশ্বে মন হবে শৃঙ্খলবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সঙ্গীত।
আহা! তখনই তো শিল্প মুক্ত, শিল্পীগণ যোগীজনোচিত॥
(চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর, পৃ. ৬২)

এই 'মুক্ত' শিল্প এবং 'যোগীজনোচিত' শিল্পীই কবির প্রত্যাশা। 'সমালোচক' যাই বলুন কবি জানেন তাঁর সৃষ্টি কোন 'অলস নন্দনতত্ত্ব' নয়। তবু শ্রমিক ও কৃষকের অনুষঙ্গে জাগে ক্ষীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব:

এ কি শুধু অলস নন্দনতত্ত্ব? তা হতেও পারে বা।
অবশ্য এখানে বাঁচা-বাঁচায় লড়াই
বর্ষার আরম্ভ থেকে শরতেও মৃত্তিকায় সেবা।
হেমন্তেও জের তার, কোনোবার শ্রমের বড়াই
বাস্তবে সফল হয়, কোনোবার ন জানন্তি দেবাঃ।

পিতামহ-মহী সেই মহীদাস বংশের ভূদাস,
সমর্থ চাষীর সঙ্গে সহযোগী,-অন্তত রোগা রোগা
ধেনুর পালক—
ইচ্ছাটা প্রবল বাপঠাকুর্দার মতো হবে লাঙল বা
গো যান-চালক।
("শ্রাবণের দৃষ্টি ঘ্রাণ প্রাণ", 'উত্তরে থাকো মৌন', পৃ. ১২)

বিষ্ণু দে-র কাব্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তও উত্থাপন করেছেন। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩) গ্রন্থ-সূত্রে ১৭ অক্টোবর ১৯৫৩ তারিখের এক পত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে-কে লেখেন :

> আপনার সৃজনীশক্তি সত্যই বিস্ময়কর, এবং অন্তত আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। এ-দিক থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় ; এবং আমি যত দূর জানি, গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে অপর কোনও বাঙালী কবির লেখনী এমন অবাধে চলেনি। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আমার পূর্বপরিচিত, কিন্তু সেগুলিকে একত্রে পেয়েই, বুঝলুম আপনার প্রেরণা কত স্বচ্ছন্দ ; এবং আমাদের দেশ ও কাল আপাতত যখন এবংবিধ প্রাচুর্যের পরিপন্থী, তখন আপনার মত ও পথের গুণ না গেয়ে উপায় নেই।
>
> কিন্তু আমার স্বভাব যেহেতু বিপরীত, তাই আপনার কাব্যাদর্শ আজও আমার কাছে অল্প-বিস্তর অস্পষ্ট ; এবং বুঝি বা সেই কারণেই এখনও আমার মনে হয় যেন আপনার পদ্ধতি ও প্রসঙ্গের মধ্যে কোথায় একটা বিবাদ আছে। নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দেখেও, আপনি কবিতা লেখার সময়ে যুক্তির সাধারণ্য ছেড়ে, ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের আশ্রয় নেন ব'লেই, আমি এ-সন্দেহ উত্থাপন করছি না, আমার বিচারে আপনার রচনারীতি যতটা সঞ্চারী, আপনার বক্তব্য ততখানি পরিণামী নয় ; এবং এখানেও আপনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সহধর্মী—ভাবের ধ্যানেই আপনার আনন্দ, ভাবনার প্রগতিতে আপনি অপেক্ষাকৃত উদাসীন।

বলতে পারি না তাই কি না, আমার বিবেচনায় আপনার কোনও কোনও দীর্ঘ কবিতার সংক্ষেপসাধন সম্ভব; ···

আসলে আপনার নামকরণ অনেক সময় অর্থগ্রহণের সহায় নয়, অন্তরায়; এবং "অক্টোবর দিনগুলি" যে পৌর্বপর্য বিরহিত দিনলিপি, তা বুঝতে দেরি লাগে ওই নামের দোষেই। উক্ত অনৈক্যের প্রতিবিধানকল্পেই আপনি বোধহয় শুধু বিরামচিহ্নের ব্যবহারে নয়, অনুয়ের প্রতিও বিমুখ; এবং তৎসত্ত্বেও যাদের মন আমার মতো গদ্যধর্মী, তাদের কাছে আপনার অনেক কবিতা খণ্ড খণ্ড ভাবে উপভোগ্য। আপনার ছন্দ-প্রকরণেও স্বেচ্ছাচার রয়েছে; ···

আপনার আর আমার উপলব্ধি মূলেই আলাদা ব'লে উক্তির খুঁটিনাটি নিয়ে এত সময় কাটালুম; কিন্তু একথা মানাও আমার পক্ষে অসম্ভব যে কার্যগতিকে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির যে-চেহারা আমি দেখেছি, তার সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা খাপ খায়না, আমি যেহেতু শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা অন্ধ, সেই জন্যে; এবং মার্কসবাদের প্রভাবে বা অভাবে দৃষ্টিভঙ্গী যতই বদলাক না কেন, তাতে যদি বস্তু-জগতেরও রূপান্তর ঘটে, তবে আপনার আমার কাব্যবিনিময় পণ্ডশ্রম। অগত্যা আমি ভাবতে বাধ্য যে আপনার বক্তব্য আদ্যন্ত অনুভূত নয়; এবং তাই বুঝি আপনার কাছে বনস্পতি উপমা আর দিউগাশভিলি উপমান (৩০ পৃষ্ঠা)।

সে যাই হোক, বিশ্বাসগত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও যে এ-বইয়ের অনেক কবিতা তথা অসংখ্য পংক্তি আমাকে চমৎকৃত করেছে, তা আপনার অবিসংবাদিত কবিপ্রতিভার কল্যাণে; এবং সেই জন্যেই অন্যত্র যদি আমার অবিশ্বাস অন্তত সাময়িক ভাবেও না ঘুচে থাকে, তবে আপনিই দায়ী। অবশ্য আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ বেশী হলে, আপনার একাধিক ইঙ্গিত-উল্লেখ আমাকে এড়িয়ে যেত না; কিন্তু আমার শিক্ষা-দীক্ষার দৈন্য ঘুচলেও, আমি "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার"-এর প্রত্যেক "তুমি"-কে

চিনতে পারতুম কিনা সন্দেহ ; এবং তার কারণ এক দিকে যেমন এই যে আপনি তাদের পরিচয়প্রকাশে অনিচ্ছুক, তেমনই অন্য দিকে এমন মনে করাও হয়তো নিতান্ত অন্যায় নয় যে আপনি তাদের পরিচয় এখনও পুরোপুরি ব'লেই, আপনার কাব্যে তাদের স্বাতন্ত্র্য অনুপস্থিত।··· ইতি ১৭ অক্টোবর ১৯৫৩[৩৪]

বিষ্ণু দে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর প্রস্তুনাম গ্রহণ করেন রবীন্দ্র-পংক্তি থেকে। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৫৮) গ্রন্থে রবীন্দ্র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ। ঐ নামের কবিতায় আছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তীব্র প্রশ্ন :

তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য, কবি ?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি ?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ ?
কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা,
বাদলের প্রবল প্লাবন
সবই শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ ?
(ব. পঁ., পৃ. ২১৭)

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকতায় নিঃশেষ নন এই বিশ্বাস থেকেই কবির এই উচ্চারণ। এ-গ্রন্থের "রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল" শীর্ষক সংকেটে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র এ-পর্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এ-জন্য সমগ্র কবিতাটিই উদ্ধৃতিযোগ্য :

এ প্রশ্নের কি উত্তর ? এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোন্ ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে,
কিংবা কবে কোন্ দিন ঋতুতে ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ্য-উহ্যের
মধ্যাহ্নে উষার স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ ?
আশৈশব যে আলোয় রৌদ্রখর আভায় পাণ্ডুর
নিশ্বাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, ব্যথাতুর,

কখনও বা হর্ষময়, সাতকোটি সবাই অরুণ
এক সূর্যরথের সারথি, সপ্তাশ্বের পদধ্বনি
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে চৈতন্যের কোষে কোষে ;
আমরা কেমন ক'রে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি
কোন্ রবিরশ্মি কোন্ বাঁশি কোন্ তূর্যের নির্ঘোষে
কবে বা কখন কিসে ক'রে দিলে রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী।
আমাদের সূর্য-দেখা সূর্যালোকে প্রত্যূষে, প্রদোষে ॥
(ব. পঁ., পৃ. ২৩৬)

এ-গ্রন্থের "গান" কবিতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে উজ্জ্বল জেগে ওঠে দেশ :

সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল, পেল থেকে থেকে একা ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী।
রবীন্দ্রনাথের গান হ'য়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।
(ব. পঁ., পৃ. ২৬০)

অন্যদিকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' (১৯৬৩) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপিত হন এক অসাধারণ বিশ্লেষণ-সূত্রে :

রবীন্দ্রনাথের গল্প সবাই জানেন :
সকলই প্রস্তুত, মেরাপবাঁধানো উঠান প্রাঙ্গণ,
ভিয়েনে আগুন জ্বলে, দেউড়িতে সানাই
বাতাস ভরপুর করে বিশ্বব্যাপ্ত শুদ্ধ সুরে সুরে,
... ...
রবীন্দ্রনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে এঁকেছেন কবি
আমাদের সকলের জীবনের ছবি,
মর্মভেদী ভীষণ অদ্ভুত—
বিবাহের সকলই প্রস্তুত,
এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে, শুধু বর নেই—
(ব. পঁ., পৃ. ৬-৭)

নগর-জীবনে সুখের সব আয়োজন আছে কিন্তু সুখ নেই। এই বাস্তব জীবনসত্যই এখানে প্রত্যক্ষ।

বিষ্ণু দে-র চেতনায়, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে, রবীন্দ্রনাথ ক্রমে প্রার্থিত পূর্ণতার প্রতীকে পরিণত :

১ আমরাও জানি তা, ভাবিও তাই যে,
তাই মনে রং ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে
নন্দিত জীবনে নির্ভীক অজস্র রঙে ফুল ফোটে
('সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে,' ব. পঁ., পৃ. ৮৮)

২ এখন কি বোঝো তুমি বিপরীতে এক অভিন্নতা,
রবীন্দ্রনাথের কথা : সৌন্দর্যের আনন্দ-বেদনা ?
স্মৃতির মর্যাদা পেলে আকাঙ্ক্ষায় রাঙে যে তীক্ষ্ণতা,
সে তীব্র বিষণ্ণ হর্ষে কেন তুমি হবে ম্রিয়মাণ ?
('রবীন্দ্রনাথ,' ব. পঁ., পৃ. ১৩৫)

৩ জাগে সেই রাবীন্দ্রিক সুন্দরের বেদনার আনন্দিত সুর
আমারও শরীরে জাগে ছাদে-ছাদে নীল ধরাজলে ॥
('রাবীন্দ্রিক সুন্দরের,' সেই অন্ধকার চাই, পৃ. ৩৮)

৪ হেরে গেছে ওরা। গায়ে লজ্জার গ্লানিই, তবু মন
রাবীন্দ্রিক প্রাণ পেল ত্রিকালের ত্রিশূল প্রহরে ॥
('তবু রাবীন্দ্রিক প্রাণ পেল,' ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে, পৃ. ৪১)

৫ কি লেখেন ? উপন্যাস ?
অন্য এক গোরার বিকাশ ? কিংবা কোনও দামিনীর আরেক বিন্যাস?
কোনও অন্যায় বা অপরিচ্ছন্ন চিন্তার বিষয়ে
প্রতিবাদী ব্যাখ্যার প্রবন্ধ ? বা ভাষণ ?
নাকি কোনও দীর্ঘায়ু কবিতা ? ছন্দে মিলে
নিরবচ্ছিন্ন বুননে মনে মনে কালের রাখাল বাঁশরির লয়ে লয়ে ?
('চার দশকের পুরানো ছবি', ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে, পৃ. ৮০)

৬ দলে দলে শিকারী-শিকার মানুষের ভয়াল জঙ্গলে নয়,
শহরে ও গ্রামে বলি নয়, আপন হৃদয়ে ইতিহাসে
এখানে নামুক সন্ধ্যা পূরবীতে
সূর্যদেব জাগুক বিভাসে
পুনর্বৃত্তে উপমা রূপকে ধন্য
রাবীন্দ্রিক আত্মস্থ সঙ্গীতে নির্ভীক ছবিতে ॥
('রাবীন্দ্রিক আত্মস্থ সঙ্গীতে নির্ভীক ছবিতে', ঈশাবাস্য দিবানিশা, পৃ. ২)

৭ আজও চাই সকলেই কেউ জেনে কেউ বা না বুঝে,
নামাই মানসগঙ্গা রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে,
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে সমতলে মন্দিরে গম্বুজে।
('রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে', ঈশাবাস্য দিবানিশা, পৃ. ৫৭)

৮ আর রবীন্দ্রনাথের স্থিতধী বিরাট দৃষ্টি
দেখা যায় চতুর্দিকে এখানে ওখানে মনে মনে,
ভুবনডাঙার মাঠে ব্যাপ্ত রৌদ্রে কোপাইতে বৃষ্টিজলে
চতুর্দিকে যথার্থই নানা মৌল শিলাইদায় শান্তিনিকেতনে,
('আষাঢ়ের ওপারে ওইপারে', চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর, পৃ. ১৮)

৯ তোমার আমার কয়েকজনার মানস রাবীন্দ্রিক
ভাষাই খোঁজে, যদিও সেই মহাপুরুষ একক মাহাত্ম্যে
অতুলনীয়, যেন বা অতিমানব, নৈরাত্ম্যে
স্বাধীন তিনি। একালে বুঝি কেউই নেই সেই রকম কেন্দ্রিক।
('ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু', চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর, পৃ. ৪১)

যেমন রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ তেমনি বিষ্ণু দে-র অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ লেনিন। লেনিন-প্রসঙ্গ উপস্থাপনে কবি প্রত্যক্ষ ও স্বচ্ছ এবং কাব্যপংক্তিসমূহ স্বতঃ বিশ্লেষিত :

১ স্বাধিকারে মুক্তি আজ, ন্যায়যুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন।
এবারে আরম্ভ হল মনুষ্যত্বে প্রাণের মনের
ক্ষুরধার দ্বন্দ্ব আর সমাধা-সাধনা, ভেদহীন

সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়। শ্রমিকজনের
সাগরসঙ্গমে আজ উৎস্রজিত রুশ জনগণ।
তোমাদের ভগীরথ—বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন ॥
('৭ই নভেম্বর', ব. পঁ., পৃ. ৪৪৬)

২ (এ মৃত্যু মৃত্যুও নয়, সেকথা শেখালে তুমি
হে প্রাজ্ঞ লেনিন! ভুলি নি, চূড়ালা!
অবীচিকর্কশ শুধু পঙ্কক্লেদে ভেসে যায় ডালা
মরণের শূন্যমরু অগ্নিস্রোতে), নিরানন্দভূমি
নরকের অট্টনাদে আকস্মিকে অমানুষ পরস্পরাহীন
('চৈতে-বৈশাখে', ব. পঁ., পৃ. ৪০১)

৩ মানুষ অজেয়, নির্বোধ বিমূঢ় অসহায় আজ সারা পৃথিবীর
সামান্য মানুষ, সাধারণ লোক, অমর আকাশ আজ
প্রতি চিদম্বরে উত্তরাধিকার, সাধারণ্যে জনসাধারণে,
মৃত্যুহীন প্রাণ মাতে কোটি কোটি প্রাণে দেশে দেশে
তুষারে আগুন জ্বালে, মরুদাহে ফলায় ফসল, এই আজ ইতিহাস,
লেনিন অমর কোটি কোটি লোকে, যেন বা কৈলাসে
সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, শান্তির প্রেমিক এক জীবনের দোষেগুণে
প্রেমের ইস্পাতে ॥
('তুষারে আগুন জ্বালে—লেনিন', ব. পঁ., পৃ. ১৯৪)

৪ তাই অন্ধকারে প্রতিরাত্রে আমরা কজনা থাকি ছদ্মবেশে,
সদাজাগ্রত বীক্ষায়, যেমন ছিলেন লেনিন স্তালিন
উনিশশো সতেরোর অক্টোবরে উদ্যত প্রস্তুত,
প্রায় সেই মন নিয়ে—
('সার্কাসের বাঘ', ব. পঁ., পৃ. ১০৬)

৫ সপ্তাশ্বের শতবর্ণ বাদীপ্রতিবাদী মহিমায় ঐকতান :
হে বন্ধু এবার আর নয় জীর্ণ বিবাদীর গান!
আর বাহুবদ্ধ সিক্তবাস পৃথিবী-ক্রন্দসী নিয়ে আসে ধানী রঙে
হেমন্তের দিন।

শুনেছি তাই তো এনেছিলেন লেনিন।

.. ..

মাটিতেই প্রাণ জাগে আকাশের বক্ষলগ্ন পৃথিবীর নবভাষ্যে।
যে মাটিতে অক্টোবর উপনীত দ্বিজ নভেম্বরে।
('আমাদের কবির প্রত্যাশা', ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে, পৃ. ৬১)

৬ আশ্চর্য ঘটনা এই বটে! মানুষের ইতিহাসে রুশের লেনিন।
ইতিহাসে দেখি ভাসে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কত দিগ্বিজয়ী বীর
সাগরা ভূখণ্ডের লোভে মত্ত!
অথচ বস্তুত দেখি সূর্য
লেনিনের মহাবিশ্বে গান করে অনির্বাণ কিংবা রাত্রিদিন।

লেনিনের মনীষার হস্তাক্ষর বিশ্বব্যাপ্ত আজ ইতিহাসে,
অটল নেতৃত্বে বীর্যে কণ্ঠ যার ত্রিকালে বাজায় তূর্য
অভ্রান্ত চিন্তায় তীব্র। অথচ স্বভাবে তিনি আত্মস্থ সজ্জন।

শক্তির পুরাণ তিনি চান নি, ও গড়েন নি, সুস্থ, বীর, স্থির
আজীবন স্বয়ং ছিলেন মানবিক সাধারণ্যে অসামান্য জন।

কেন বা সবাই চিন্তা করি না যে লেনিনের প্রাজ্ঞ প্রতিভাসে!
(*Lenin and no myth of Lenin*, ঈশাবাস্য দিবানিশা, পৃ. ২১)

৭ তাই আজ মনে হয় যদি সারা দেশ ভাবে, ভাবে প্রতিদিন
সাধারণ মানুষেরা, সকলেই, নিত্য ভাবে-দীন হই নই কভু হীন
তাহলে হয়তো হবে প্রতিমাস অক্টোবর, প্রতিদিন প্রত্যেকে লেনিন।

শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই হয়ে যাবে
শতায়ু লেনিন।[৩৫]
('মনে হয় প্রত্যেকে লেনিন', ঈশাবাস্য দিবানিশা, পৃ. ২২)

৮ তাহলে? দুর্দিন হবে কি ক'রে সুদিন?
চেষ্টার অসাধ্য তা কি? শ্রেয়ই তো প্রেয়?

সত্য আজ লেনিনেরই। আসার রুদিন্ ॥
('সত্য আজ লেনিনেরই', চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর, পৃ. ৪৩)

৯　তখন বোঝাই যায় চৈতন্যে নিমগ্ন-কিম্বা উর্ধ্বায়িত সত্যে
বিশ্ব সদা এক বিশ্ব,
মূলতই যেন বিশ্ব লেনিনের বিশ্ব আজ জীবনের সর্বদেশে সর্বস্তরে।

ফলে, কেউই যেন দেহে মনে দুস্থ নয়, কারণ কেউই আর নেই নিঃস্ব।
('যেন বিশ্ব লেনিনের বিশ্ব', চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর, পৃ. ৪৬)

মার্কসবাদী চিন্তার প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র অভিযাত্রা অনলস। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এর "২৯শে নভেম্বর" কবিতায় 'মাইকে'/'স্ট্রাইকে' এই ধরনের মিলের নবত্ব যেমন আছে, তেমনি আছে সর্বপ্লাবী প্রত্যাশা :

আজ সে আসবে পথে প্রকাশ্যের বিজয়-তোরণে,
হৃদয়স্পন্দন আজ অতিকায় হাজার মাইকে
গোপন প্রেমের মৃদু দীর্ঘশ্বাস আজ বিস্ফোরণে
আসমুদ্র হিমালয় ঢেকে দেবে নূতন স্ট্রাইকে
মজুর মালিক যাতে বাহুবদ্ধ মিটিঙে মিছিলে,
বিরোধীর কণ্ঠ রুদ্ধ বন্ধুত্বের মহাসমুদ্রিকে,
লালদীঘির ধূসরিমা ধুয়ে যায় পথে ঘাটে ঝিলে,
লাল তারা জ্বলে আজ সর্বত্র দেশের দশদিকে!

আজ সে আসবে, আজ রেখে যাবে বিরাট ইঙ্গিত,
ভবিষ্যৎ রেখে যাবে কোটী কোটী হৃদয়ের মিলে,
সে আসে যে দেশ থেকে, সে ভূস্বর্গে জীবনের ভিত
আরেক পত্তনে পাকা, মানবিক প্রেমের নিখিলে
সেখানে মানুষ ন্যায়ে স্বাধীন ও নির্ভয় মানুষ।
সেখানে উত্তরে তাই দক্ষিণের ফুলফল ফলে,
মরুভূমি গায় আহা বাংলার আষাঢ়ের জলে।
সে দেশের হাওয়া আজ এনে দেবে রুশের পৌরুষ॥
('২৯শে নভেম্বর', ব. পঁ., পৃ. ২২৩)

এই কাব্যের "মালার্মে : প্রগতি" কবিতায় প্রগতির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন কবি : "নব প্রাণ প্রতিষ্ঠায় মনীষার প্রতীক : প্রগতি" (ব. পঁ., পৃ. ২৪৪)।

"শতমুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়" কবিতায় 'কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের' অনুবাদ সংযুক্ত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই গানের নজরুল ইসলাম-কৃত রূপান্তর উৎকৃষ্টতর এবং গান হিসেবে আদৃত ও স্থায়ী আবেদনসঞ্চারী। এই কবিতার শেষাংশে কবি আপন দেশের পরিবেশ বিশ্লেষণ করেছেন এবং উপনীত হয়েছেন এক ধরনের উপসংহারে :

দরিদ্রের অছিবাদ ভারতের অর্থের অনর্থে
জন্ম থেকে অসম্ভব, সাম্রাজ্যের আস্তাকুঁড়ে নিজ বাসভূমে পরবাসে
সে কোন্ কুকুর হবে অন্যদের অছি, হবে যন্ত্রের মালিক ?···
এদিকে অভাব আর অন্যদিকে অপচয়
কখনও বা লোভের স্বেচ্ছায়, কখনও বা অকর্মার অনিচ্ছায়—
এই আমাদের ছবি, বুর্জোয়ো বিকাশে
লাভে আর লাভের দায়িত্বে আমাদের দেশ
ল'ড়ে গ'ড়ে চলেনি অনেকদিন, কয়েক শতক।
('শত মুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়', ব. পঁ., পৃ. ২৮৫)

'আলেখ্য' কাব্যে কানে বাজে জীবনের 'মহাসমুদ্রের অশান্ত গর্জন' এবং প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি :

কবে যে মানুষ প্রকৃতির রঙে সাজবে,
এ গ্রাম শহর আর নয়!
অত্যাচারের অমোঘ নিয়মে সুখী-অসুখীর বিচ্ছেদ ভেঙে
কবে যে সবাই বাঁচবে!
('হেমন্ত', ব. পঁ., পৃ. ১৮৯)

এরই পরিণাম-আকাঙ্ক্ষা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র বিভিন্ন চরণে :

সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচাবার আশা নেই, বাঁচবার ভাষা নেই,
··· ··· ···
তাই তো মাঝে মাঝে রাজার ছেলে
মিছিল করে কলরবে।

রাজার মেয়ে তাই হৃদয় মেলে
ধর্মঘটে গৌরবে।
এরা যে ভালোবাসে, তাই তো ঘৃণাতে
আগুনে জ্বালে দেহমন।
এদের অভাবের অগ্নিবীণাতে
জীবন পেল যৌবন।
('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত', ব. পঁ., পৃ. ৪-৫)

'সমস্ত শিকল' ভেঙে, সব 'আশা ও হতাশা'র পূর্ণতায়, 'মনের আকাশে মুক্ত' জীবনের গান গেয়ে ওঠেন কবি; বলেন একে 'বলা যায় নিরুদ্দেশ', তবে তা 'রুজির চিন্তায় নয়, মুনাফার দায়ে নয়' ('ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে', ব. পঁ., পৃ. ১৬)। পল রোবসন (ঐ, পৃ.২৪) কবিতায় ধ্বনিত সেই মুক্ত জীবনের গান :

প্রকৃতির জয়ে শুভ্র হৃদয়ে ধরেছে সে ইতিহাস,
রক্তের লালে সারা বিশ্বের পেয়েছে সে আশ্বাস ;

'সেই অন্ধকার চাই' (১৩৭৩) গ্রন্থে পুনশ্চ তুলে ধরেন সাম্যের বিশ্লেষণ :

তেমনি ইতিহাসে, কেউ কুকুর না উচ্ছিষ্ট-গাদায়,
কর্মী আর কর্তা জেনো আমরাই, কেউ নই ঠিকে
কিবা রুশে কিবা চীনে কিবা বাংলায়—ঠেকে শিখে
নিকট বিকৃতি ব্যাপ্ত দিগন্তে কি রূপান্তর চায় ?
('নিকট বিকৃতি', সেই অন্ধকার চাই, পৃ. ৩৭)

তবে এ-গ্রন্থের 'স্বদেশী কবিতা'য় তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন: 'বাংলা থেকে আমাদের বিশ্বে আগমন' (পৃ. ৭১)। উল্লেখযোগ্য যে, কবির দৃষ্টি সাধারণতঃ রুশে নিবদ্ধ, বারবারই ফিরে এসেছে রুশ-প্রসঙ্গ। তাই এই উচ্চারণ, এই বাংলার পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'সংবাদ মূলতঃ কাব্য' (১৯৬৯)-এর ''একটি অসম্পূর্ণ কবিতা''য় (পৃ. ৮৫) সমকালের তথ্যাবলী ঈষৎ ব্যঙ্গে উচ্চারিত—'মালুম' 'হালুম' শব্দ প্রয়োগে

তা এক ধরনের তীক্ষ্ণতাও পেয়েছে। এ-কাব্যের "এ কী গান ভাসে" (পৃ. ১০২) কবিতায় 'মানবপুত্রে'—তথা মানবসভ্যতায় আস্থা কবিকে সংকট উত্তরণে আশাবাদী করেছে।

'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৩৭৭) কবি আবার কর্মী মানুষের (মাঝিরা মাল্লারা পৃ. ১৬) সহযাত্রী। বলছেন: "মানুষ আশ্চর্য জীব, গড়ছে নিজেই বিশ্বের মানুষ" ('স্পষ্টকে চাই', পৃ. ১৮)। তবু প্রশ্ন:

এখানে প্রকৃতি রিক্ত, তাই কি মানুষের মহাযুদ্ধ
স্বচ্ছ সরল ? সাংবাদিকতা নয়, বরঞ্চ কবিতা,
কিংবা গানের মতোই। গুপ্তি মন্ত্রণাসভা নয়।

এদেশে নগ্ন বক্ষ করেছে ক্ষুধায় ক্ষুধায় শুদ্ধ
তাই কি সকাল-সন্ধ্যা মুক্তি, তাই বরেণ্য সবিতা
রাঙায় পাহাড় মাঠ ক্ষেত বন সমান জ্যোতির্ময় ?
('৭ই নভেম্বরের রোজনামচায়', ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে, পৃ. ৬২-৬৩)

শ্রম ও নন্দনের সমাহার রচনাই কবি বিষ্ণু দে-র আজীবন সাধনা। 'ঈশাবাস্য দিবানিশা'য় ফিরে আসে সে-প্রসঙ্গ:

··· চৈতন্যের পাহাড়ে নদীতে এক নীতি
নির্ধারিত করে, যার দীর্ঘ ইতিহাস ব্যেপে এক কাম্য বোধে
রমণীয় রক্তিম আলোয় সূর্যোদয়ে মধ্যদিনে, অস্ত সূর্যে
শ্রমে ও নন্দনে আফ্রিকায়, এশিয়ায় মুরলী মৃদঙ্গ তূর্যে ॥
('আফ্রিকায় এশিয়ায়', ঈশাবাস্য দিবানিশা, পৃ. ৩৯)

'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' কাব্যের "অসম্পূর্ণ বর্তমানে"(পৃ. ১৬) এই শিরোনামেই চলমানতা বিধৃত—যেন অনিঃশেষ মানবিক গল্প। এ-কাব্যের "মন্ত্রী মশা" কবিতায় ব্রেখটের চিন্তা —"ব্রেখটের উত্তরাধিকার মানি": এই স্বীকৃতির পর—সরাসরি অনূদিত হয়েছে:

ব্রেখটের উত্তরাধিকার মানি,
মস্ত লেখক, মানুষও বীরত্বপূর্ণ :—

সেই যে বলেন :
জেনারেল ! তোমার ঐ ট্যাংকটা জবরগাড়ি বটে,
একাই ছাতু করতে পারে
একশো মানুষকে।
কিন্তু ওর একটি দুর্বলতা ;
ওকে চালাবার জন্য লাগে মানুষ।

মন্ত্রী মশা', তোমার হুকুমবরদার রেলগাড়ী জবর।
বাতাসের মতো জোরালো ওর ছুট, ভারও বইতে পারে
রাজধানীর হাতীর চেয়ে বেশী,
কিন্তু ওর ঐ একটি গলদ :
ওকে চালাতে গেলে মানুষ লাগে, মজুর লাগে।
রেললাইনে রেলগাড়ি চালায় মানুষেই।
সিদ্ধান্তের সময়টা সে ভুল করতে পারে
এলোমেলো নেতৃত্বে।
কিন্তু সে মানুষ, ও মন্ত্রী মশা'!
সেও তোমারই মতো, তোমার বাপ-ছেলের মতো
বাঁচতে চায়।

('মন্ত্রী মশা', চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর, পৃ. ২৩)

উল্লেখযোগ্য যে, এই কবিভাষা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরূপ। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সহজ গদ্যাত্মক চরণে চিত্র রচনা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। বলা যায়, এ-পর্যায়ে বিষ্ণু দে অনুরূপ নিরীক্ষা করেছেন। এ-কাব্যের "জানোয়ারির কাহিনী"ও (পৃ. ৬৬) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সমসাময়িক রাজনীতি-বিষয়ক ব্যঙ্গ এই কবিতায় প্রত্যক্ষ :

পার্লামেণ্ট কোথায় সেই টেম্‌স নদীর ধারে,
আবার দেখ কুরুক্ষেত্র এই যমুনার পারে।
বোল্‌স্—শাহেবের কোলাকুলি, কর্তনা সং দেশে,
কংগ্রেস তো ওয়াশিংটনে, আবার কংগ্রেসে !

রামরাজ্য-সভায় জনগণ দেখে যা ম্যাজিক !
বাবু সাজেন কৃষকপ্রজা, নিদারুণ সামাজিক ।
('জানোয়ারির কাহিনী', চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর, পৃ. ৬৬)

এ-কাব্যের "জমিদারী লোপ" (পৃ. ৬৯) কবিতায় এক চরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এঙ্গেল্‌সের একটি সুপরিচিত বাক্য : "quantity changing into quality" ।

মার্কসবাদী চিন্তা পরিবেশের যে পীড়ন ও অন্তর্বিপর্যয়ের মুখোমুখি সে-প্রসঙ্গ কবি উত্থাপন করেছেন "উত্তরে থাকো মৌন' কাব্য গ্রন্থে :

তবু এ অঞ্চলে সংগ্রামী চৈতন্য প্রায় ক্ষীণকায়,
শুধু শ্রেণী উত্তরণ, শুধু এরা সাজের চমক চায়—
অবশ্য সবাই নয়, তবে অনেকেই, অর্ধজ্ঞানী, শিকি-বিজ্ঞ
কিছু নবনবীনের বংশ ।
তাই সততাও ক্ষীণ-প্রাণ, অন্তত তা দোআঁশলা, খিন্ন ।
গ্রামীণ সমাজে আজ গ্রাম্যতাই প্রায় ছিন্নভিন্ন ।
('যৎসামান্য গোষ্পদ এবারে', উত্তরে থাকো মৌন, পৃ. ৩৯)

বিষ্ণু দে-র কাব্যজীবনে মার্কসবাদ আশাবাদেরই দ্যোতক। এই আশাবাদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথাই তিনি বলেছেন পৌনঃপুনিক উচ্চারণে। কিন্তু জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে সে-আশাবাদ বাস্তবায়নের কোন সম্ভাবনা যেন তিনি দেখছেন না। নাগরিক বুদ্ধিজীবীর সংকট এ-পর্যায়ে তাঁকে বিচলিত, বহুলাংশে বিমর্ষ করেছে।

কবি বিষ্ণু দে-র সৃষ্টি-সম্ভার বিপুল। স্মরণীয়, তিনি এলিয়ট, পাউন্ড, অডেন, স্পেন্ডার, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, মালার্মে, আরাগঁ, এলুয়ার এবং আরো অনেক বিদেশী কবির আত্মীয়। তবু দ্রুত তিনি স্বভূমি পেয়েছেন; হননি স্বদেশে উদ্বাস্তু, দেখেছেন তাঁর দেশের পরিপ্রেক্ষিত থেকে। তাই চিন্তার সংকট যখন ইউরোপীয় কবিকুলকে এবং স্বদেশে বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে নীরব করে দিয়েছে—তাঁদের অনেককেই স্বল্প রচনার জন্যে আত্মগৌরব পোষণ করতেও দেখি,—তখন বিষ্ণু দে সৃষ্টি-প্রবাহে সচলতায়

থেকেছেন অনলস। মার্কসবাদে বিশ্বাসের প্রশ্নে সংকট এসেছে, এসেছে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দ্বন্দ্ব। সেখানেও তিনি সুধীন্দ্রনাথ অডেন স্পেন্ডারের মত পিছিয়ে যাননি। তাঁর সম্পর্কে আবু সয়ীদ আইয়ুব একবার বলেছিলেন :[৩৬]

> Bishnu De, who loves to be a Marxist, though it is doubtful if he is or ever will be a full blooded one. Bishnu De is far too sophisticated — bourgeois to the roots of his being — to be a poet of the proletariat. But that is his *Sadhana*.

এই সাধনায় যথার্থই বিষ্ণু দে অবিচল। উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা এবং পরবর্তী সকল সংকটের মধ্যে আশাবাদের প্রবল শিখা জ্বালিয়ে চলেছেন তিনি—লোরকার সেই কমরেডের মত, কিম্বা নিজেরই "শেষ রোমান্টিকের" অপূর্ণ প্রত্যাশার অভিযাত্রার।

ভাষা ছন্দের সতত নিরীক্ষামুখীনতা, সাঙ্গীতিক থেকে গদ্যাত্মকতায়, ছড়া থেকে সংলাপে, অনায়াস যাতায়াত করেছেন তিনি। লিখেছেন যথার্থ "ফ্রী ভার্স", নানা মিত্র ছন্দ—এবং বাঙালী আধুনিক কবিদের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা।

বলাবাহুল্য তার সবই উত্তরণের মহিমা পেয়েছে সে-দাবী কেউ করেন না। কিন্তু তাঁর কাছে উত্তরসূরীদের যা শেখার সে হচ্ছে কবির কাজ মূলতঃ শ্রমের, অভিনিবেশের, অভিজ্ঞতার ও প্রত্যয়ের।

তথ্যনির্দেশ

১ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ১৯৩৩-এ এবং 'চোরাবালি' ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হলেও 'উভয় গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার রচনা একই সময়ে। এমনকি চোরাবালির কিছু কবিতা উর্বশী ও আর্টেমিসেরও আগে লেখা।' অরুণ সেন : বিষ্ণু দে'র রচনাপঞ্জী, পরিচয়, মে-জুলাই ১৯৭৯ ক্রোড়পত্র, পৃ. ১৫২

২ বিষ্ণু দে : সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, "এলিয়ট", পৃ. ১২৬

৩ বিষ্ণু দে : পূর্বোক্ত, "আরাগঁ", পৃ. ৭৩

৪ Mr. Eliot Among the Arjuns, T. S. Eliot—A Symposium, Ed. Tambimutta & Richard March ; Poetry, London, 1948 ; "Homage to T.S. Eliot, In the Sun and the Rain, Essays on Aesthetics, 1972, New Delhi ; Peoples Publishing House, 1972. এই প্রবন্ধের 'বঙ্গীয় সংস্করণ' "টি.

এস. এলিয়ট'', সাহিত্য পত্র, কার্তিক ১৩৫৫; 'এলিয়টের কবিতা' ১ম সংস্করণ, ভূমিকা প্রবন্ধ, কলকাতা; সিগনেট প্রেস, ১৯৫৩। দ্বিতীয় সংস্করণে বর্ণিত, 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' (১৯৫৮) এবং 'জনসাধারণের রুচি' (১৯৭৫) গ্রন্থে সংকলিত।

৫ ঘোড়সওয়ারের প্রতীককে খুব গুরুত্ব দেননি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বলেছেন: ''এর যৌন প্রতীক আমার কাছে অজ্ঞাত নয়, নৃতত্ত্ব আমিও কিছু পড়েছি কিন্তু সে-সব কথা অবান্তর···''। এ কবিতায় যা তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন তাহল : এমন সংহত আবেগ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ।'' পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪৫। পুনর্মুদ্রণ, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ৫৯

৬ মণীন্দ্র রায় লিখেছেন: ''সমর সেন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার' কথাটার মানে কি? সরল বিশ্বাসে আমি যা বুঝেছি জানালাম তাকে—জনতার ভিড় জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের মত উপচে পড়ছে। সমরবাবু জানালেন তিনিও এতকাল ঐ রকমই ভাবতেন। কিন্তু সেটা ভুল। বিষ্ণুবাবু কবিতাটির একটি ইংরেজী অনুবাদ করেছেন এবং সেটা ছাপাও হয়েছে। তা দেখে সমরবাবুর খটকা লাগায় তিনি নিজেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবিকে। তিনি বলেছেন ঠিক অনুবাদই ছাপা হয়েছে। 'জোয়ার নেমেছে' মানে জোয়ার নেমে গেছে। অর্থাৎ এখন ভাটা এসেছে। আর সেই জন্যে ঠিক পরেই রাখা হয়েছে 'হৃদয়ে আমার চড়া'—যেটা জোয়ার চলে যাওয়ারই পরিণাম হিসেবে দেখা দিয়েছে।''—মণীন্দ্র রায়, ১৯৮১, আমার কালের কবি ও কবিতা, কলকাতা. কথামালা, পৃ. ২০-২১

৭ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ''চোরাবালি'', কুলায় ও কালপুরুষ, ১৩৬৪. কলিকাতা: সিগনেট প্রেস, পৃ. ১০১—০২

ভারতীভবন প্রকাশিত বিষ্ণু দে'র 'চোরাবালি' প্রথম সংস্করণ 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক মুখবন্ধসহ' মুদ্রিত হয়, মুখবন্ধের তারিখ ৬ আশ্বিন ১৩৪৪। সিগনেট সংস্করণে এই মুখবন্ধ বর্জিত হয়েছে। ''চোরাবালি'' নামে প্রবন্ধটি প্রথমে সুধীন্দ্রনাথের 'স্বগত' ও পরে 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। অরুণ সেন, পূর্বোক্ত, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ১২ দ্রষ্টব্য)।

৮ বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৮ সালেই বিষ্ণু দে-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ''এ-সব শব্দ ব্যবহার করে সত্যি লাভটা কোথায়? হয়ত কথাগুলোর জমকালো আওয়াজই প্রীতিকর, কিন্তু শারীরিক আলস্য অভিধান দেখার বিঘ্ন, এবং সাধারণ অভিধানে হয়ত সব পাওয়াও যাবে না। আপনার কি মনে হয়না যে সৎপাঠক এসব শব্দে প্রতিহত হবে?''—কালের পুতুল (১৯৪৬), সংস্করণ ১৯৫৯, কলিকাতা, নিউ এজ, পৃ. ৭৯

৯ বৈকালী কবিতার এই ষষ্ঠ অংশ 'কবিতা' পত্রিকার কার্তিক ১৩৪৬ সংখ্যায় ''এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে'' শিরোনামে ছাপা হয়। এ-সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: ''বাংলা কবিতার আসরে তিনি (দিনেশ দাশ) প্রথম এসেছিলেন আজ থেকে বছর ষোলো আগে, 'কাস্তে' কবিতার চমক তুলে, যে কবিতায়, জীবনানন্দর 'কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ'-এর উপমা উল্টিয়ে, তিনি কাস্তেটাকেই 'এ যুগের চাঁদ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই কবিতা বিখ্যাত হয়েছিল—নিজের গুণেও বটে, এবং তারই একটি লাইন নিয়ে বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পাল্লা দিয়ে কবিতা লিখেছিলেন বলেও।'' (কবিতা, আশ্বিন ১৩৫৯)। 'কবিতা' পত্রিকার কার্তিক ১৩৪৬ সংখ্যায় বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একই শিরোনামের কবিতা দুটো পরপর ছাপা হয়। (অরুণ সেন, পূর্বোক্ত পৃ. ১৫) কাস্তের সঙ্গে কত রকম মিল দেয়া যায় এটাও ছিল বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি পরীক্ষা।

১০ এই অংশ 'ছুটি' নামে ১৯৪০ সালে ছাপা হয়, 'কবিতা' চৈত্র ১৩৪৬ সংখ্যায়, দ্রষ্টব্য : অরুণ সেন, ঐ ।

১১ পূর্বলেখ, ১৯৪১, কলকাতা : কবিতাভবন ।

১২ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'পূর্বলেখ', 'কবিতা', চৈত্র ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ৬৭

১৩ সমর সেন, 'পূর্বলেখ', 'অরণি', ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ, 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ৬৩—৬৪

১৪ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

১৫ ঐ, পৃ. ৬৭—৬৮

১৬ ঐ, পৃ. ৬৮

১৭ 'চতুর্দশপদী' ১৪ টি কবিতার শেষে তারিখ আছে ১৯২৭, 'বছর পঁচিশ', পৃ. ৪৭২, কিন্তু কবিতাগুলো ছাপা হয় ১৯৩৮-৩৯ সালে : চতুর্দশপদী (শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে) ৪টি, কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৫ ; চতুর্দশপদী ৫টি, কবিতা, পৌষ ১৩৪৫ ; চতুর্দশপদী ৫টি, কবিতা, চৈত্র ১৩৪৫ । সম্ভবতঃ ১৯২৭ ছাপার ভুল, ১৯৩৭ হবে । তাছাড়া পূর্বলেখের প্রথম সংস্করণে কবিতাগুলো ১৯৩৫-৪০-এর রচনা বলে উল্লেখও আছে, পূর্বে দ্রষ্টব্য।

১৮ বুদ্ধদেব বসু, "সাত ভাই চম্পা", 'কবিতা', আষাঢ় ১৩৫২ ; পুনর্মুদ্রণ, 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ৭০

১৯ ঐ, পৃ. ৭১

২০ অরুণ মিত্র, "সাত ভাই চম্পা", 'অরণি', ২৫ মে ১৯৪৫ ; পুনর্মুদ্রণ, 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ৭৩

২১ কাজী নজরুল ইসলাম, "যা শত্রু পরে পরে" (১৩৩৩), 'ফণিমনসা', নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৭, পৃ. ৮৮

২২ কাজী নজরুল ইসলাম, "হিন্দু মুসলমান যুদ্ধ" (১৩৩৩), 'ফণিমনসা', নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯০

২৩ অরুণকুমার সরকার, "সন্দীপের চর", 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৫ ; পুনর্মুদ্রণ, 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ৭৭

২৪ মণীন্দ্র রায়, "অনিষ্ট", 'নতুন সাহিত্য', অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, পুনর্মুদ্রণ, 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ৭৯

২৫ অরুণ সেন, পূর্বোক্ত 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ২৮

২৬ সাহিত্যপত্র, বৈশাখ ১৩৮২, 'পরিচয়,' ঐ, পৃ. ২৯

২৭ ঐ

২৮ 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা', বীরেন পাল (ভবানী সেন-এর ছদ্মনাম), মার্কসবাদী, প্রথম সংকলন, অক্টোবর ১৯৪৮, 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক', ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : জুন ১৯৭৫, পৃ. ১৯-২৩

২৯ 'সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি', ঊর্মিলা গুহ (প্রদ্যোৎ গুহ-র ছদ্মনাম), মার্কসবাদী, প্রথম সংকলন, অক্টোবর ১৯৪৮, 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক', ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : জুন ১৯৭৫, পৃ. ২৯-৩০

৩০ 'আরাগঁ', সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২), মূল রচনা ইংরেজীতে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়—The Poetry of Louis Aragon, *The People*, 8 May 1949. এরই পরিবর্তিত বাংলা রূপ 'একটি বিকাশের ধারা ; আরাগঁ', 'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৬। এ প্রবন্ধই 'আরাগঁ' নামে 'সাহিত্যের ভবিষ্যতে' সংকলিত হয়।

৩১ কবিতাটির চারটি অংশ। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ মাঘ ১৩৫৬ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ শ্রাবণ ১৩৫৭ সংখ্যা 'সাহিত্যপত্রে' প্রকাশিত হয়। প্রথমাংশের শিরোভূষণ দুটি উদ্ধৃতির একটি ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের সিদ্ধান্ত : "Hence man also creates according to the laws of beauty"। গ্রন্থে উদ্ধৃতি বর্জিত হয়। দ্রষ্টব্য : অরুণ সেন, পূর্বোক্ত।

৩২ তুলনীয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ওরা কাজ করে', আরোগ্য-১০, র-র ২৫, পৃ. ৪৯-৫১

৩৩ স্মরণীয় রবীন্দ্রপংক্তি: "একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়", 'নৈবেদ্য' - ৮১, র-র ৮, পৃ. ৬৩

৩৪ 'দেশ', শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৬, পৃ. ১০৯-১২

৩৫ তুলনীয় : 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।' —সুকান্ত ভট্টাচার্য, 'লেলিন', ছাড়পত্র।

৩৬ *Quest*, July-Sept. 1960